স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখা



কিশোরদের জন্য
লেনিন কথা

রামধনু


СТАРОНОСОВ

স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখা

কিশোরদের জন্য লেনিন কথা

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

সঙ্কলক: আনাতোলি মিত্যায়েভ

অনুবাদ: বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

অঙ্গসজ্জা: ইউ. মার্কভ

КОСТРЫ

(ДЕТЯМ О ЛЕНИНЕ)

Сборник рассказов советских писателей:

З. Воскресенской, М. Шагинян, Л. Радищева,
М. Прилежаевой, Н. Ходзы, А. Кононова, П. Капицы,
В. Бонч-Бруевич, С. Алексеева, С. Антонова, Л. Воронковой.

На языке бенгали

সূচি

প্রকাশকের কথা

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন...

পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে লোকে এই নামটি জানে না।

১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে রাশিয়ার জনগণ লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লব ঘটাল — স্থাপন করল পৃথিবীর প্রথম সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের জীবন এবং কর্ম বিরাট, বিপুল। তাঁর সুমহান কর্মযজ্ঞের পূর্ণ বিবরণ একখানা বইয়ে তুলে ধরা সম্ভব নয়।

এই কাহিনী-সংকলনে তাঁর জীবনের মাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা দেওয়া হল। আমরা আশা রাখি যে, বিদেশে কিশোর-কিশোরী পাঠক-পাঠিকারা খুবই আগ্রহসহকারেই বইখানা পড়বে। তাদের কাছ থেকে চিঠি পেলে আমরা আনন্দিত হব।

আমাদের ঠিকানা: 'প্রগতি' প্রকাশন, মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন।

জ. ভস্ক্রেসেনস্কায়া

সেণ্ট স্তানিস্লাভের অর্ডার

১৮৮৬ সালে নববর্ষের প্রাক্কালে উলিয়ানভ বাড়িতে ছোটদের ছদ্মবেশী প্রহসন — যা হয় প্রতি বছর। বাড়ির কর্তা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ ফার কোটটাকে উল্টে পরেছেন, আর একটা নকল লম্বা দাড়ি লাগিয়ে নিয়েছেন। মা মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাঁকে পেঁজা তুলো দিয়ে একটা টুপি তৈরি করে দিয়েছেন; ফারগাছটার পাশে তিনি দাঁড়িয়েছেন, ঠিক যেন 'হিম দাদু' — তফাত শুধু এই যে, নকল পাকা ভ্রূর নিচে দিয়ে তাকানো তাঁর চোখ দুটো তরুণ আর খুশি ভরা।

রঙীন ক্রেপ্ কাগজ দিয়ে তৈরি 'রূপকথার' পোশাকগুলোর খসখস আওয়াজে বৈঠকখানা ভরে উঠেছে। একটি ছিল সুন্দরী স্পেনীয় মেয়ে, তার হাতে পাখা — তার কালো চোখ দুটো মুখোসের ভিতর দিয়ে ঝিকমিক করে। সে কখনও বুট-পরা বিড়ালের পাশ ছাড়ে না; বিড়ালকে দেখতে কিন্তু আর কিছুর চেয়ে দ্য' আর্তান্যানের সঙ্গেই মিল বেশি। এই জোড়কে ওলিয়া আর ভালোদিয়া বলে কেউ চিনতে পারে নি। কিন্তু রূপকথার লাল টুপি-পরা মেয়ে সেজেছে মানিয়াশা — সে সবাইকে চিনতে পারছে। রাখাল মেয়ে হল ওলিয়ার বন্ধু সাশা শেচর্বো, ডন কুইক্সট হল মিতিয়ার বন্ধু আলিওশা ইয়াকভলেভ, ক্ষুদে বামন তো সাত বছর বয়সের সাশা ইশের্স্কি ছাড়া কেউ হতেই পারে না। মানিয়াশা কিন্তু মাকে বড়দি আনিয়া বলে মনে করেছিল। কয়েক গজ করে সবুজ ফুঁপি দিয়ে জড়ানো কৃশ ফারগাছ দুটির নাচ হল সবচেয়ে ভাল। তবে, মা-ফারগাছের সবুজ টুপির ভিতর দিয়ে এক-গাছা পাকা চুল উঁকি দিচ্ছিল।

বুট-পরা বিড়ালের কল্পনাশক্তি চমৎকার। সে যেমন অভিনেতা, তেমনি পরিচালক — তার উপর সে তৈরি করছিল হরেক রকমের হেঁয়ালি। ছোট ছেলের চেরা-গলায় সে ছিল মূল-গায়েনও বটে।

'আমি মলাম, ওগো প্রিয়া,' এই বলে বিড়াল তার স্পেনীয় মেয়ের উদ্দেশে প্রণয়সংগীত গাইল। তার পরে সুর একবারে সপ্তমে চড়িয়ে গান ছেড়ে সে হেসে ফেটে পড়ল, আর একটা সাদা থাবা দিয়ে মুখোসের মধ্যে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'দেখছো তো আমার প্রিয় সেনোরিতা, আমি খতম...'

উলিয়ানভ বাড়িতে শেষরাত্রি অবধি আলোগুলো জ্বলজ্বল করল। ফারগাছে মোমবাতি বদলানো হল দু'বার। নেচে-হেসে সবাই একবারে পড়ে যাবার মতো ক্লান্ত হয়ে পড়ল। মা-ফারগাছ পিয়ানোতে বাজাচ্ছিলেন আবেগপূর্ণ ওয়ল্স্ নাচ আর উদ্দীপনাময় লোকনৃত্যের সুর। কত গান যে গাওয়া হল সে রাত্রে!..

শুতে যাবার সময়ে সবাই অবসন্ন, কিন্তু খুশি। ইস্কুলে ছুটির তখনও পুরো এক সপ্তাহ বাকি।

*

ছুটি শেষে ফুরোল।

ভালোদিয়া, ওলিয়া, মিতিয়া আর মানিয়াশা একদিন সকালে যে যার ব্যাগে বই পুরে নিয়ে ইস্কুলে গেল। ইলিয়া নিকোলায়েভিচ তাঁর কাজের কামরায় বসে বার্ষিক বিবরণ তৈরি করছিলেন।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আর আনিয়া ঘরে-তৈরি সাজগুলো ফারগাছ থেকে খুলে জুতোর বাক্সে গুছিয়ে রাখতে রাখতে পিটার্সবুর্গে সাশার ব্যাপার নিয়ে কথা বলছিলেন; সবার বড় ছেলের ছুটি কেমন কাটল তাই নিয়ে তাঁরা বলাবলি করছিলেন। আনিয়া পিটার্সবুর্গ যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন; সেখানে তিনি কলেজের পড়াশুনা আবার আরম্ভ করবেন।

ফারগাছটাকে দীনহীন দেখায়। তার কাঁটাগুলো খসে খসে পড়ে; ডাল থেকে সোনালী পাতের ঝুরিগুলো ঝোলে যেন শরতে মাকড়সার জাল। গাছের তলে বরফের মতো দেখাবার জন্যে কিছু পটাসিয়ম ক্লোরেট বিছানো ছিল।

আনিয়া সাজের বাক্সগুলোকে চিলে-ঘরে নিয়ে গেলেন। হল-ঘরে তাক থেকে বোতল-ধোয়া বুরুশ নিয়ে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তেলের বাতিগুলোর সব কাচের চিমনি পরিষ্কার করতে লেগে গেলেন। তিনি স্বামীর কাজের কামরায় যান আলগোছে। ইলিয়া নিকোলায়েভিচ ডেস্কে কাজ করছিলেন। তিনি বসে ছিলেন খুব সোজা হয়ে — যেভাবে তিনি ছাত্রদের বসতে শেখান। তাঁর হাতে কলমটা শক্ত করে ধরা; সামনে কাগজ সামান্য বাঁদিকে কাত করা। তিনি নিজে যা করেন না এমনকিছু কখনও ছেলেমেয়েদের করতে শেখান না।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বাতি থেকে কাচের চিমনিটা খুলে নিয়ে তার উপর হাঁফ ফেলে বুরুশ দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে কাঁচি দিয়ে পলতেটাকে ছেঁটে দিলেন। বাইরে তুষার ঝড় চলছিল; শহরের উপর নেমে আসছিল শীতের আশু গোধূলি।

'এখনও আলো জেবলো না,' ইলিয়া নিকোলায়েভিচ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললেন, 'এসো, এই আবছা আলোয় কিছুক্ষণ বসি।'

'তোমার এখন একটু জিরনো দরকার।'

'আমি ক্লান্ত হই নি। কাজটা আর সামান্য বাকি আছে।'

তাঁর সুন্দর স্পষ্ট হাতের লেখায় ভরা পাতাগুলো তিনি একবার উল্টে গেলেন।

'মাশা, তোমার মনে আছে — ষোল বছর আগে আমরা যখন সিমবির্স্কে আসি তখন ছিল মাত্র...'

'উননব্বইটা ইস্কুল গোটা অঞ্চলে,' কথাটা যুগিয়ে দিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'আর, ঐ সমস্ত ইস্কুলে ছাত্র ছিল কত?' কথাটা যাতে পরীক্ষকের মতো শোনায় তাই একটু কৃত্রিম কৌতুকের স্বরে তিনি প্রশ্নটা করলেন।

উত্তরটা মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার জানা ছিল খুব ভালভাবেই: গোটা অঞ্চলে ইস্কুলে মোট দু' হাজার ছাত্র।

'আর, এখন দেখো, ইস্কুল চার-শ' চৌত্রিশটা — তাতে ছাত্রসংখ্যা কুড়ি হাজারের বেশি।'

তাঁর গলার স্বরে গর্ববোধ।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা জানতে চাইলেন:

'তার মধ্যে মেয়ে কত?'

'তিন হাজারের বেশি। সেটা তেমন কিছু নয়।'

গোটা অঞ্চলের কোন ইস্কুলে একটিও মেয়ে ছিল না — সেটা লক্ষ্য করে তাঁর বড় খারাপ লেগেছিল, সেই কথা মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার এখন মনে পড়ল। কৃষকদের মেয়েদের ইস্কুলে পাঠাতে রাজি করাতে কত না বেগ পেতে হয়েছিল।

'মাশা, ভাবো তো একবার — গ্রামগুলোয় সাক্ষরের সংখ্যা এখন আগের তুলনায় দশগুণ। আর তুমি কিনা বলছ এখন আমার 'জিরনো দরকার!' এইসব অঙ্ক দেখে আমার খুশিতে বুক ভরে ওঠে, কিন্তু এখনও বিস্তর কাজ বাকি আছে! গোটা অঞ্চলে প্রত্যেকটি মানুষ যেদিন সাক্ষর হবে, আহা, সেদিন অবধি বেঁচে যদি দেখে যেতে পারতাম! উঁ? কী বলো — তা দেখে যাব আমরা?'

'নিশ্চয়ই।'

হল-ঘরের বারান্দায় কে যেন জমাট বাঁধা বুট ঠুকে বরফ ঝাড়ল। ডাক নিয়ে এসে ঢুকল বার্তাবহ মিখেইচ।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আলো জ্বাললেন, শিখাটা গোটা পলতে বেয়ে উঠলে পরে চিমনিটা বসিয়ে সবুজ বাতি-ঢাকনাটা লাগিয়ে দিলেন।

'কাজান থেকে একখানা দরকারী চিঠি এসেছে।'

ইলিয়া নিকোলায়েভিচ প্রকাণ্ড লেফাফাখানা লম্বালম্বি কেটে বের করলেন বেশ পুরু একখানা কাগজ — তাতে রুশ সাম্রাজ্যের প্রতীক চিহ্ন সীলমোহর করা। সেটা চটপট খুঁটিয়ে পড়ে নিয়ে তিনি কষ্টে শ্বাস ফেললেন।

'মাশা,' তিনি বললেন অবসন্ন গলায়, 'আমি প্রথম শ্রেণীর সেণ্ট স্তানিস্লাভের অর্ডার পেয়েছি।'

'অভিনন্দন!'

স্বামীর ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা থেমে গেলেন। তিনি একখানা চেয়ারের পিঠটা চেপে ধরে তার উপর বসে পড়লেন।

'এই শেষ, মাশা। এই হল শেষ ঘণ্টি। জানো, এর মানেটা কি? এর মানে হল — মিস্টার উলিয়ানভ, এবার আপনার অবসর গ্রহণ করবার সময় হল। অবসর গ্রহণ করতে হবে!' এই অদ্ভুত কথাটা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ নিজে কান পেতে শুনলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পিছনে হাতে হাত ধরে পায়চারি করতে থাকলেন।

তাঁর কথার ভীষণ অর্থটা এতক্ষণে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বুঝতে পারলেন। তাঁর মনে পড়ল, কুড়ি বছরের কাজের জন্যে তাঁকে আন্নার অর্ডার দেওয়া হলে সেটাকে তিনি বলেছিলেন প্রথম ঘণ্টি; পঁচিশ বছরের কাজের জন্যে সেণ্ট ভ্লাদিমিরের অর্ডার ছিল দ্বিতীয় ঘণ্টি। বরখাস্ত হয়ে যাবেন বলে তখন তাঁর মনে উদ্বেগ ছিল। কিন্তু এখন তিরিশ বছর কাজের পরে তাঁকে পেনশন দিয়ে অবসর গ্রহণ করানো হবে।

সামনে ডেস্কের উপর খোলা কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে ইলিয়া নিকোলায়েভিচ বললেন:

'এই তাহলে আমার শেষ বার্ষিক রিপোর্ট? এখন কি হবে? এখন কি তাহলে এই চুয়ান্ন বছর বয়সে আলখাল্লা আর চটি পরে শুধু জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব জীবনপ্রবাহ? সেই নাকি অবসরগ্রহণ? সেটা তো মৃত্যুর চেয়ে নিকৃষ্ট।'

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা স্বামীকে এত দুঃখে অভিভূত, এত ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়তে দেখেন নি আর কখনও।

১২ তিনি ইতস্তত করে কথা তুললেন:

'হয়ত আপিল করা যেতে পারে?'

'তাতে কোন কাজ হবে না। ভাবো তো একবার — আমাকে পেনশন দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে! অথচ, এখনও তো ছেলেপিলেদের জন্যে ভাবনা রয়েছে। আমার পেনশনের পয়সায় আমাদের আট জনের চলবে কেমন করে?'

'সে কথা ভেবে মন খারাপ কোরো না,' শান্তভাবে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে আমরা একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নেব। আমি খরচ বাঁচিয়ে চলতে পারব। তাছাড়া, ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা শেষ করে ফেলবে কখন দেখে টেরই পাবে না।'

'কিন্তু আমার যে এতসব পরিকল্পনা ছিল!' উনি বলে উঠলেন বড় ক্ষোভে। 'ইস্কুল আছে চার-শ' চৌত্রিশটা, কিন্তু হওয়া চাই হাজারটা। শত শত ঝকঝকে নতুন ইস্কুল, সব মানুষ সাক্ষর, গোটা অঞ্চল শিক্ষিত — এই ছিল আমার স্বপ্ন। আর, তার জায়গায় পেলাম কিনা একটা অর্ডার— সাদা পাড়-লাগানো লাল চওড়া ফিতের উপর একটা সোনার ক্রুশ, একটা রুপোর তারা। কী জাঁকালো, কী আড়ম্বরময়! আর লাটিন ভাষায় খোদাই করা আছে কিনা 'প্রিমিয়ান্দো ইন্‌সিতাৎ!' অর্থাৎ কিনা, 'পুরস্কারে উৎসাহদান!' কী ভণ্ডামি! 'উৎসাহদান'! কিসের জন্যে? কোন্ উদ্দেশ্যে! কাজ করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সেটাকে বলে উৎসাহদান!'

তাঁর উঁচু কপালখানা ঘেমে উঠল।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার অশেষ মনস্তাপ। উদ্বেগটা যেন গলা দিয়ে ঠেলে উঠতে চায়। তিনি ভেবেই পান না কী করে স্বামীকে একটু সাহায্য করবেন, কী বলে তাঁকে একটু সান্ত্বনা দেবেন।

'ইলিয়া, যেকোন ইস্কুলেই তুমি তো সব সময়েই অভ্যাগত হিসেবে সংবর্ধনা পাবে।'

'অভ্যাগত?' উঁচু কলারটার বোতাম খুলতে খুলতে ইলিয়া নিকোলায়েভিচ বললেন, 'কিন্তু, যে শিক্ষণপ্রণালীটাকে আমি নির্ভুল বলে বুঝি সেটা চালু করতে দেবে কি? দেবে কি নতুন নতুন ইস্কুল খুলতে? 'প্রিমিয়ান্দো ইন্‌সিতাৎ!'' দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বিড়বিড় করে এমনভাবে কথাটা উচ্চারণ করলেন যে, সেটা যেন কোন অশ্লীল কথা।

'একটা মানুষের কাজে শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষের মুহূর্তে তাকে যেতে দিতে পারে বলে তো মনে হয় না। আপিল করো। তোমার কাজকে তারা খুবই মূল্যবান মনে করে তো বটে।'

'কত যে মূল্যবান মনে করে সেটা তো দেখতেই পাচ্ছ,' উনি বললেন তিক্ত হাসি হেসে।

'একটাকিছু উপায় বের করা যাবে। আমি জানি বের করা যাবেই একটা উপায়। শেষে সবকিছু

ঠিক হয়ে যাবে। তুমি একটু বিশ্রাম করার সুযোগ পাবে, আর, হ্যাঁ, তোমার অভিজাত উপাধিটা সম্বন্ধে কিছু করা দরকার কিন্তু। তার অধিকার তুমি পেলে এই তৃতীয় বার।'

'তাতে করে কী পাব আমি? পাব কাজ করবার অধিকার?'

'ওটা ছেলেমেয়েদের কাজে লাগবে। উপাধি থাকলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারবে আরও সহজে। পরবর্তী জীবনে এতে তাদের সুবিধে হবে।'

'কোন তাড়া নেই।'

'তুমি এটাকে ঠেলে ঠেলে রেখে আসছ এই চার বছর হল,' তাঁর কথায় একটু অনুযোগের সুর।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা স্বামীর মনটাকে একটু অন্য দিকে ফেরাতে চাইছিলেন, কিন্তু ইলিয়া নিকোলায়েভিচ ভেবে ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলেন। যতদূর তাঁর মনে পড়ে, তিনি বরাবর কাজ করেছেন, সব সময়ে থেকেছেন মানুষের মধ্যে। কিন্তু নিজে কোন কাজে লাগবার যে-একমাত্র উপায় তিনি জানেন সেটা থেকে তিনি এখন বঞ্চিত হচ্ছেন।

সরকারী বিদ্যালয়গুলির পরিচালক সেণ্ট স্তানিস্লাভ অর্ডার পুরস্কার পেয়েছেন, এ খবর দ্রুত সারা সিম্‌বির্স্কে ছড়িয়ে পড়ল। বাড়ি ছেয়ে গেল আগন্তুকে: সহকর্মীরা, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত লোকজন, সবাই আসতে থাকলেন অভিনন্দন জানাবার জন্যে। তাঁকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে সেটা বাস্তবিকই বিরাট।

এলেন পরিদর্শক ইভান ভ্লাদিমিরভিচ ইশের্‌স্কি। তাঁর আনন্দ অকৃত্রিম। ইলিয়া নিকোলায়েভিচ তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি এই পুরন বন্ধুটির আশাভঙ্গ করতে চান নি, তাছাড়া, এই বন্ধু যে তাঁর মনোভাব বুঝবেনই না সেটা তিনি জানতেন — কেননা, অনেকে মনে করে যে, লোকের কাজকর্মের চেয়ে উপাধি আর পদকই বড় পরিচয়। এইসব সরব অভিনন্দন কিন্তু ইলিয়া নিকোলায়েভিচকে মনমরা করে দিল। হঠাৎ তিনি বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হল যে, এ'রা সবাই আসলে তাঁকে বিদায় দিচ্ছেন।

তিন দিন পরে ১০ই জানুয়ারি তারিখে ইলিয়া নিকোলায়েভিচ স্ত্রীকে বললেন:

'এইসব হট্টগোলে আমার গা বমি-বমি করে, মাথা কামড়ায়। আর কাউকে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে দিয়ো না।'

তিনি কৌচে শুয়ে পড়লেন। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাঁর কপালে ঠাণ্ডা পটি দিলেন।

'বাছারা, কেউ গোলমাল কোরো না — উনি অসুস্থ বোধ করছেন,' এই বলে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ভালোদিয়াকে এক পাশে ডেকে তাকে ডাক্তার আনতে পাঠালেন।

ডাক্তার দেখলেন, তাঁর কোন রোগ হয় নি। এটা মনে হয় গা বমি-বমি আর অবসন্নতার তুচ্ছ ব্যাপার। একখানা ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা সারা রাত জেগে বসে থাকলেন। পরদিন তিনি অস্থির হয়ে এ-কামরা ও-কামরা করে বেড়ালেন — তিনি স্থির হতে পারছিলেন না।

১২ই জানুয়ারি তারিখে একটু ভাল বোধ করে ইলিয়া নিকোলায়েভিচ আবার তাঁর বার্ষিক রিপোর্ট তৈরি করবার কাজে হাত দিলেন।

সেদিন অত্যন্ত বিশ্রী তুষার-ঝড় চলছিল। ছেলেমেয়েরা ইস্কুল থেকে ফিরে বাবার কাজের

কামরায় তাকিয়ে দেখল তাদের বাবা আবার যথারীতি কাজে বসেছেন। তার মানে তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন। কিন্তু আবহাওয়ার বিরূপ ক্রিয়া ঘটছিল তাদের সবার উপর। মানিয়াশা আর মিতিয়া খিটখিটে হয়ে উঠল, তারা খেলায় ঝগড়াঝাটি করছিল, তাই মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা মিতিয়াকে পাঠিয়ে দিলেন তার বন্ধু আলিওশা ইয়াকভলেভদের বাড়িতে, আনিয়া মানিয়াশাকে নিয়ে গেলেন উপর তলায় ওলিয়া আর ভালোদিয়ার কাছে। আনিয়া তাদের বললেন পিটার্সবুর্গ সম্বন্ধে — পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দরী এই নগরী সম্বন্ধে; ধবল রাতে নেভা নদীর ধারে মুক্তার মতো কত রঙের খেলার কথা তিনি বললেন; ডিপ্লোমার জন্যে কাজে ব্যস্ত রয়েছেন তাদের বড়দা সাশা — তাঁর কথাও সব তিনি বললেন। তিনি ছুটিতে বাড়ি আসেন নি — তার কারণ তাঁর মনে হয়েছে যে, তিনি আর আনিয়া দুজনেই বাড়ি এলে মা বাবার খরচ পড়ে যেত বেশি। সামনের বছর ভালোদিয়া আর ওলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাস করবে। তখন তারাও পড়তে যাবে পিটার্সবুর্গে। আগামী বছর এ পরিবারে ছাত্র হবে চার জন।

'ট্রেনে চড়তে তোমার ভয় করেছিল?' প্রশ্ন করল ওলিয়া: উলিয়ানভ বাড়ির ছোটদের কেউ তখনও ট্রেনে চাপে নি।

'না, একটুও না। কিন্তু ট্রেনে বড় ভিড় আর গুমসো,' বলল আনিয়া।

মানিয়াশা বলল:

'কোন ডেক্‌ও নেই?'

'না, নৌকো করে যেতে ঢের বেশি ভাল লাগে।'

'আমরা চার-জনে সবাই মিলে রোজ সন্ধ্যায় নদীর ধারে বেড়াতে যাব,' এই বলে ওলিয়া দিদিকে জড়িয়ে ধরল।

তবে, ভালোদিয়া বলে রাখল যে, সে কিন্তু সন্ধ্যাগুলো কাটাবে গ্রন্থাগারে।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ছিলেন খাবার ঘরে। তিনি সেলাই করতে চেষ্টা করলেন, সেটা ছেড়ে বুনতে বসলেন, কিন্তু কোনটাই করতে পারলেন না। 'এ কী হল? এত অস্বস্তি বোধ করছি কেন? ডাক্তার তো বললেন — কিছু না। বোধ হয় সাশা কাছে নেই তাই? কিন্তু কাল তো তার সুন্দর চিঠিখানা এসেছে। এমন লাগছে বোধ হয় ঐ তুষার-ঝড়েরই জন্যে?'

সেলাইয়ের কাজটা রেখে দিয়ে তিনি কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে কাজের কামরার দরজা খুললেন। ইলিয়া নিকোলায়েভিচ ডেস্কে লিখছিলেন; বাঁ হাত দিয়ে তিনি মাথায় একটা পটি চেপে রেখেছিলেন।

'মাশা, আমার বেশ ভালই লাগছে,' তিনি দরজার আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'আমার জন্যে কিছু ভেবো না।'

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা নিজের মনে বললেন, 'ভাল দেখাচ্ছে না তো ওকে।' ভাবতে ভাবতে তিনি যন্ত্রণা বোধ করছিলেন। আবার তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। শালখানা গায়ে জড়িয়ে তিনি ফলের বাগানে গিয়ে বরফ জমাট পথে পায়চারি করতে থাকলেন। আপেল গাছগুলোয় পেঁজা তুলোর মতো বরফের থোপগুলোকে দেখতে ফুলের মতো। উনি একটা ডাল ধরলে বরফটা ঝরে পড়ে গাঁটওয়ালা কালো ডাল দেখা গেল।

উনি ঘরে ফিরলেন। ইলিয়া নিকোলায়েভিচ তখনও কাজের কামরায়। তাঁর সহকারী এসেছিলেন; শেষ করা রিপোর্টটা তাঁরা দুজনে মিলে দেখছিলেন। ডিনার খেতে বসে তিনি স্ত্রীর অন্যমনস্কতা নিয়ে ব্যঙ্গ করলেন; ভালোদিয়াকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন সে দাবা খেলতে চায় কিনা। কাঠ থেকে তিনি যে ঘুঁটিগুলো তৈরি করেছিলেন সেইগুলো দিয়েই খেলা হত। কিন্তু হঠাৎ মত বদলে উনি গিয়ে কৌচে শুয়ে পড়লেন।

একটু পরে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাকিয়ে দেখলেন তিনি ঘুমোচ্ছেন। আরও কাছে গিয়ে তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না যে, উনি আর বেঁচে নেই।

তিনি ডাক্তারকে বললেন:

'উনি নিশ্চয়ই মূর্ছা গেছেন।'

তিনি আপন মনে বলতে থাকলেন:

'উনি মারা যান নি! উনি মারা যেতে পারেন না!' তাঁর মন বলছিল যে, তাঁর মৃত্যু তত নিদারুণ নয়, কিন্তু তাঁকে ছাড়া, স্বামীকে ছাড়া, অতি অকৃত্রিম এই বন্ধুকে ছাড়া ভবিষ্যৎটা নিদারুণ। তিনি জানতেন যে, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাঁর সাহসের উপর, তাঁর স্থৈর্যের উপর।

*

বাড়িটা অত্যন্ত নিস্তব্ধ। ছেলেমেয়েরা খাবার ঘরে কাছাকাছি বসে পড়া তৈরি করছিল। কাঁধের উপর দিয়ে চেপে জড়ানো শাল গায়ে আনিয়া গরম ইঁটের উনুনে হেলান দিয়ে ছিল। ফরাসী ক্রিয়াপদ পড়তে পড়তে ওলিয়া মাঝে মাঝে চোখের জল মুছছিল। ভালোদিয়া মিতিয়াকে একটা অঙ্ক কষতে সাহায্য করছিল — কথা বলছিল খুব আস্তে আস্তে। মানিয়াশা হাতের লেখা নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিল।

বাড়িতে যেন কিছুই বদলায় নি। যেমন বরাবর, সকালে সবার আগে উঠে মা ছেলেমেয়েদের প্রাতরাশ তৈরি করেন, তাদের ইস্কুলে পাঠিয়ে দেন। তারা বাড়ি ফিরলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন কে কত নম্বর পেয়েছে। কিন্তু বাড়িটাকে খালি-খালি লাগে। বাবা নেই। বিভিন্ন ইস্কুল পরিদর্শন করবার জন্যে তিনি প্রায়ই এখানে ওখানে যেতেন। কিন্তু তাঁর ফিরবার খুশির প্রত্যাশায় সবাই থাকত। প্রায়ই শীতের সন্ধ্যায় জানালার বাইরে ঘোড়ার নাকের ভোঁসভোঁস আওয়াজ শুনে সবাই ছুটে যেত হল-ঘরে — জমাট-বাঁধা ক্যাঁচকেঁচে দরজাটা খুলবার জন্যে। প্রকাণ্ড ধূসর ওভারকোট গায়ে ওদের বাবা তখন দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতেন, তাঁর ফার কলার বরফে ঢাকা, মোচ আর দাড়ি থেকে তিনি ঝুলে আসা তুষারকণাগুলো ঝেড়ে ফেলে চুমু নেবার জন্যে ঠাণ্ডা লাল গাল এগিয়ে ধরে অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন: 'সবাই ভালো তো? সবকিছু ঠিক আছে তো?' কিন্তু তেমনটা আর ঘটবে না। বাবার কাজের কামরার দরজা বন্ধ। সন্ধ্যায় মা সেখানে একা বসে থাকেন। ছেলেমেয়েরা মাকে না পেয়ে কষ্ট পায়। তারা জানত যে, রোজ সকালে তারা বেরুবার পরে দরজাটা বন্ধ হলে তার পরেই মা গোরস্থানে যেতেন বাবার কবরের ধারে। মা সন্ধ্যাবেলায় আর পিয়ানো বাজিয়ে শোনাল না ওদের। পিয়ানোটা কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া থাকে।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা স্বামীর কাজের কামরায় গিয়ে ডেস্কের কাছে বসে তন্ময় হয়ে চিন্তা করেন।

ইলিয়া নিকোলায়েভিচের পকেট ঘড়িটা ডেস্কে রয়েছে তাঁর প্রতিকৃতির পাশে। ঘড়িটা তিনি কিনেছিলেন বিয়ের আগে, তাতে দম দিতে তাঁর কখনও ভুল হয় নি। এখন ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে দেখে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ছোট্ট চাবিটা তুলে নিয়ে ঘড়িতে সযত্নে দম দিলেন। ঘড়ির ইস্পাতের হৃৎপিণ্ডটা স্পষ্ট আর সূক্ষ্মভাবে স্পন্দিত হতে থাকে। সময় কেটে চলল নির্দিষ্ট ধারায়। এখন থেকে জীবনের শেষ দিনটি অবধি ঘড়িটাকে তিনিই পকেটে রাখবেন।

খাবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি ছেলেমেয়েদের বললেন:

'আমি একটু বেড়িয়ে আসব।' যেতে যেতে আদর করে মানিয়াশার মাথায় মৃদু চাপড় দিয়ে গেলেন, আর মিতিয়ার নোটবইখানা ঠিক করে বসিয়ে দিলেন।

'মা, ভেরা ভাসিলিয়েভনা আর ইভান ভ্যাদিমিরোভিচ এসেছিলেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে,' জানাল আনিয়া, 'ওঁরা বললেন, দরকারী কাজ ছিল, কিন্তু আমরা তোমাকে বিরক্ত করতে চাই নি। ওঁরা পরে আবার আসবেন।'

'ঠিক আছে।'

ডাগর-ডাগর ম্লানিমাখা চোখ দুটো তুলে আনিয়া বলল:

'তোমার সঙ্গে আমি যাব, মা?'

'না, তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে। আমি তাড়াতাড়ি ফিরব।'

ছেলেমেয়েরা পরস্পরের দিকে তাকাল। মা আর কিছুতেই খুশি হন না — এমনকি, অত ভাল, সহৃদয় ভেরা ভাসিলিয়েভনা কাশ্‌কাদামোভাও মাকে আর খুশি করতে পারছেন না।

দরজাটা বন্ধ হওয়া অবধি অপেক্ষা করল ভালোদিয়া। তারপর চটপট উঠে পড়ে ওভারকোটটা চাপিয়ে মায়ের পিছন পিছন বেরিয়ে পড়ল। মাকে একলা থাকতে দেওয়া যায় না।

মা চলছিলেন মস্কোভ্‌স্কায়া স্ট্রীট ধরে। রাস্তায় আলো শুধু চাঁদের আর কয়েকটা গ্যাসলাইটের।

বার বছর আগে ওরা যেখানে থাকতেন, ঐ সেই বাড়িটা। এখন সেখানে অন্য একটা পরিবার থাকে।

মস্কোভস্কায়া স্ট্রীট থেকে তিনি স্ত্রেলেৎস্কায়া স্ট্রীট ধরলেন। ষোল বছর আগে নিঝনি নভগরোদ থেকে ওঁরা এসেছিলেন ঐ বাড়িটায়। ভালোদিয়া, ওলিয়া আর মিতিয়ার জন্ম হয় ঐ বাড়িতেই।

তারপর তিনি স্তারি ভেনেৎস-এ পড়লেন।

ভালোদিয়া মায়ের পিছন পিছন চলল ছায়ার মতো।

ভলগার দিকে চলে গেছে যে রাস্তাটা তার মোড়ে এসে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা থামলেন। তাঁর সামনে বরফে জমাট-বাঁধা বিস্তৃত এলাকা। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। মেঘে-ঝাপসা চাঁদ নদীর উপর ঝুলে ছিল যেন একটা নিঃসঙ্গ গ্যাসলাইটের মতো।

তিন বছর বয়সে ভালোদিয়া



বেশ বড় উলিয়ানভ পরিবার: একবারে
ডানদিকে ইস্কুলের উর্দি-পরা ভালোদিয়া



সিম্‌বির্স্কে উলিয়ানভদের বাড়ি



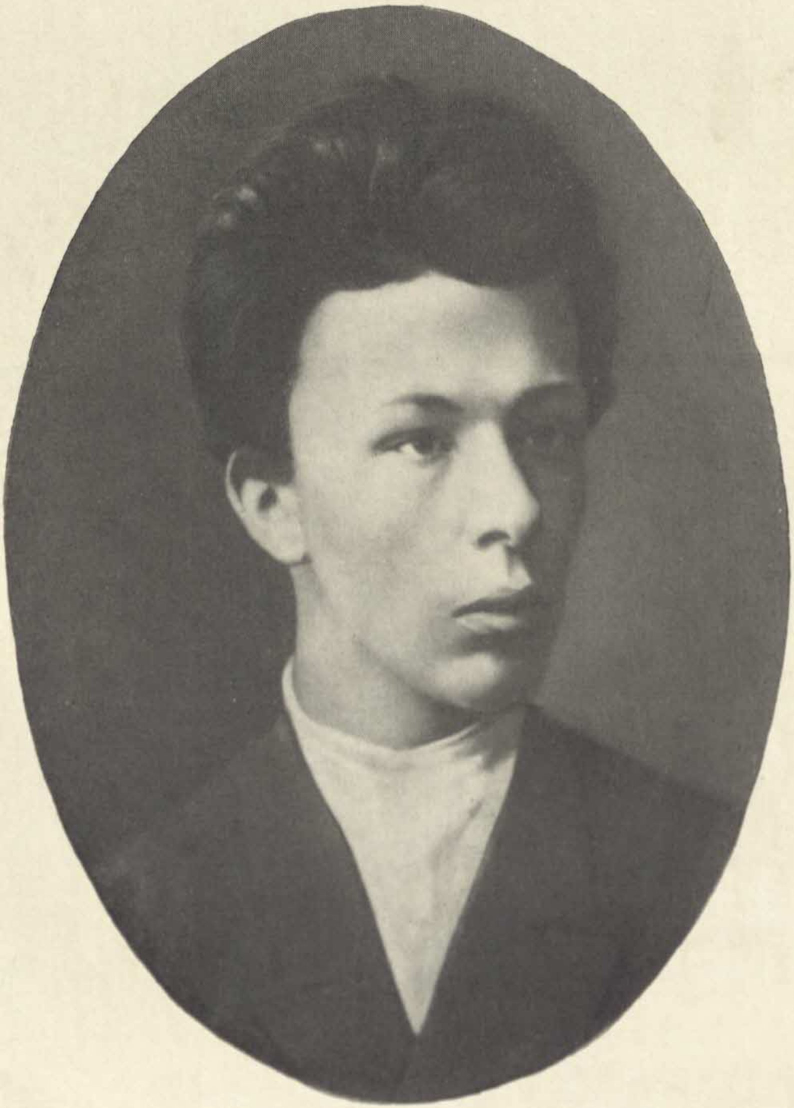
ভালোদিয়ার বাবা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ
উলিয়ানভের কাজের কামরা



তিন-তলায় ভালোদিয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদাসিধে কামরা



ভালোদিয়ার দাদা আলেক্সান্দর — তাঁকে
শ্রদ্ধা করত ছেলেমেয়েরা সবাই



না. — আলেক্সান্দর যে পথে গিয়েছিল তার
থেকে পৃথক পথই আমাদের ধরতে হবে!



ইস্কুলে পড়ার সময়ে ভালোদিয়া



হালেই, ছেলেমেয়েরা যাচ্ছিল অনেকদিনের জন্যে বেড়াতে, খুব আকর্ষণীয় ছিল তাদের সেই ভ্রমণ — সেই ভ্রমণে যাবার সময়ে তাদের বিদায় দেবার জন্যে ওঁরা সবাই সেই ঢালুটা বেয়ে নেমেছিলেন। ইলিয়া নিকোলায়েভিচ তখন বলেছিলেন, 'মাশা, সারা জীবন আমরা থাকব একত্রে।' কৌতুক করে তিনি বলেছিলেন, 'দেখতে না দেখতে কখন উড়ে যাবে একশ'টা বছর।' আর এখন নিঃসঙ্গ মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে কাটাতে হবে সেই দীর্ঘ এক শ' বছর।

মায়ের বেদনা বুঝল ভালোদিয়া। ভালোদিয়া বুঝল মা একলা থাকতে চাইছিলেন — তাঁর সেই দুঃসহ যাতনা তার দেখা ঠিক হবে না। সে একটু পিছিয়ে কাছেই একটা বাড়ির ও-পাশ থেকে অ্যাকেশিয়া ঝোপের খালি ডালগুলোর ফাঁক দিয়ে লাগাও উঠোনটা দেখতে পাচ্ছিল। ঐ বাড়িটার সেই ছোট পাশ-বাড়ি, তাতে এক সারিতে তিনটে জানালা, ঐ বাড়িতে তার জন্ম হয়েছিল। ওখানেই কেটেছে তার প্রথম শৈশব। বরাবরই পরিবারে সে ছিল মেঝো, কিন্তু এখন বাবা নেই, সাশা পিটার্সবুর্গে—এখন পরিবারে সেই হয়ে উঠেছে সবার বড় আর সবচেয়ে বলিষ্ঠ। মাকে সে সাহায্য করতে পারে কীভাবে? সবচেয়ে বেশি যাতনা ভোগ করছেন তো তিনিই।

'এখন আমরা কী করি, ইলিয়া?' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ফিসফিসিয়ে বললেন, 'তুমি ছিলে পাহাড়ের মতো—আমাদের সবার অবলম্বন। জীবন ছিল ঝলমল, আনন্দময়। তোমার বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করতাম আমরা সবাই। এখন?..'

ছ'টি ছেলেমেয়ে... তার মানে জীবনে ছ'টি পথ...

বরফে জমাট-বাঁধা ভলগার পারাপারে পথ ছিল অনেক। জমাট-বাঁধা নদীর পারে দূরে দূরে গ্রামের আলোগুলো মিটমিট করছিল। কিন্তু, তাঁর ছেলেমেয়েরা যেটা ধরবে সে পথটা কোথায়?

ছেলেমেয়েরা যখন অনেক ছোট ছোট ছিল তখন তিনি ওদের জন্যে একটা খেলা তৈরি করেছিলেন — তার নাম ছিল 'সহৃদয়তা আর সুখের রাজ্যে যাত্রা'। তাতে পিয়ানোটা ছিল ড্রাগন, তখন সবকিছু ছিল এত সহজসরল। কিন্তু জীবন এখন এত জটিল — এখন সঠিক পথটা বেছে নেবার উপায় কী?

হাওয়া বয়ে এল ভলগা পাড়ি দিয়ে — সে হাওয়ায় বরফ তাড়িত হল রাস্তা আর পথগুলোর উপর দিয়ে। চাঁদ মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে হাওয়া তাঁর কেপটাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল। হাওয়াটা গায়ে বিঁধছিল, কিন্তু সেই হাওয়া, ঠাণ্ডা, কিংবা রাত্রি, কোন দিকেই মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

'আমি কী করি? আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এরা পারবে কি সব সামলাতে?'

'মা!' ভালোদিয়া আস্তে ডাকল।

'কিরে, কি হয়েছে রে, ভালোদিয়া? কিছু হয়েছে নাকি?' তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন।

'না, সব খাসা। আমরা সবাই তোমার জন্যে বসে আছি। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

সে মায়ের বাহু ধরল পুরুষের মতো দৃঢ়ভাবে, কিন্তু ছেলেরই মতো সুশীলভাবে।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন — তিনি যেন জেগে উঠলেন একটা নিদারুণ দুঃস্বপ্ন থেকে। ছেলেমেয়েরা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। তিনি নিজে বেদনায় অভিভূত,

কিন্তু ছেলেমেয়েদের বেদনাও তো তাঁর চেয়ে কম নয়। ওদের যে তাঁকে চাই — তাঁকে যে ওদের বড় দরকার।

'চল্, চল্। চল্ জলদি করে যাই!' তিনি বললেন।

তাঁর ফিরবার জন্যে অপেক্ষা করে ছিলেন ইভান ভ্লাদিমিরোভিচ ইশের্স্কি।

'একটা সুখবর নিয়ে এসেছি। এটা হয়ত আপনার শোকে একটু সান্ত্বনা হবে। আপনার গত স্বামী যে সেণ্ট স্তানিস্লাভের অর্ডার পান সেটা আপনি সসম্মানে গ্রহণ করতে পারবেন বলে কাজানের অছিরা স্থির করেছেন।'

৬ মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মুখখানা পাংশু হয়ে গেল। ছেলেমেয়েদের দিকে একবার তাকিয়ে তিনি ইভান ভ্লাদিমিরোভিচকে কাজের কামরায় আসতে বললেন।

একখানা চেয়ারে বসে পড়ে তিনি বললেন:

'এ গ্রহণ করবার কোন অভিপ্রায় আমার নেই।'

ইশের্স্কি অত্যন্ত অবাক হয়ে তাকালেন তাঁর দিকে।

'কেন নয়? খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ পুরস্কার। এটা গ্রহণ করবার সম্মান বাবত দানশালায় দিতে হবে দেড় শ' রুবল, সেই জন্যেই বোধ হয় আপনি দ্বিধা করছেন?'

'দেড় শ' রুবল? আমাদের সাত জনের সংসার চালাতে বড় প্রয়োজন এই ছ'সপ্তাহের পেনশনের টাকা আমি দান করি কেমন করে, বলুন তো?'

'এটা ইলিয়া নিকোলায়েভিচের পরিশোধনীয় ঋণ। যদি স্বেচ্ছায় টাকাটা না দেন তাহলে খাজাঞ্চিখানা টাকাটা পেনশন থেকে কেটে নেবে। তাছাড়া, শুনুন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, পুরস্কার নিতে হয়। এটা মহা সম্মানের ব্যাপার — আর সম্মানিত হবার বাবত পয়সাও দেওয়া চাই...' ইভান ভ্লাদিমিরোভিচের স্বরে তখন একটা নিরুত্তাপ ভাব। তিনি মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মনোভাব বুঝতে পারলেন না — ঠিক যেমন তিনি কখনও বুঝতে পারেন নি যে, পরিবারের জন্যে বংশানুক্রমিক একটা খেতাব নেবার ব্যাপারটাকে ইলিয়া নিকোলায়েভিচ কেন বরাবর কেবল পিছিয়ে পিছিয়ে দিতেন।

'আপনি নিশ্চয়ই মত বদলাবেন, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।'

ইভান ভ্লাদিমিরোভিচ তাঁর এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের মঙ্গলই চান সেটা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সেণ্ট স্তানিস্লাভের অর্ডারটা যে একটা অমঙ্গলের লক্ষণ হয়ে এসে পড়েছে ওঁদের উপর, সেটা তিনি তাঁকে বুঝিয়ে বলেন কিভাবে। তিনি কি করে তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারেন যে, কাজ ছাড়তে হবে এই অবস্থাটা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি, আর সম্ভবত সেটাই তাঁকে নিহত করেছে।

'আপনি অর্ডারটা গ্রহণ করতে নারাজ, একথা আশা করি কাজানের অছিদের লিখে জানাতে আপনি আমাকে বাধ্য করবেন না?' চঞ্চল হয়ে দাড়ি টানতে টানতে ইভান ভ্লাদিমিরোভিচ বললেন, 'আপনার সম্বন্ধে আর আমাদের শ্রদ্ধেয় ইলিয়া নিকোলায়েভিচের পরিবার সম্বন্ধে তারা কি ভাববে, বলুন তো? অথচ, দানশালায় টাকাটা দিতেও তারা আপনাকে বাধ্য করবে।'

'পশ্বলের বিরুদ্ধে কী করতে পারি, বলুন?' তিক্ত হাসি ফুটিয়ে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন, 'আপনি অনুগ্রহ করে অছিদের জানিয়ে দিন যে, ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উলিয়ানভের বিধবা স্ত্রী সেণ্ট স্তানিস্লাভের অর্ডার গ্রহণ করতে নারাজ।'

ইশের্স্কি ভাবলেন:

'শোকে মানুষকে কী তিক্ত করেই না তুলতে পারে!'

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা উঠে দাঁড়ালেন — তিনি রুমালখানাকে হাতে দলে পিষে ফেললেন। তিনি তখন ছেলেমেয়েদের কাছে যেতে উদগ্রীব। আর দেরি করতে পারেন না তিনি।

জ. ভস্ক্রেসেনস্কায়া

রাত্রি

মিতিয়া আর মানিয়াশা ঘুমোচ্ছিল উপরে, বাচ্চাদের কামরায় — তারা কিছু জানল না। মা পিটার্সবুর্গে। যা ঘটেছিল সেটা প্রথমে জানলেন তিনিই।

২৮

খাবার ঘরে বাতিটায় তেমন জোর ছিল না — তার থেকে গোল হয়ে আলো পড়ছিল টেবিলের বেশকিছুটা জায়গায় আর একখানা 'সিম্‌বির্স্ক সমাচার' পত্রিকার উপর। ওলিয়া নিজের মাথাটা চেপে ধরে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সামনে পিছনে দুলছিল — চোখের জল পড়ছিল তার গাল বেয়ে।

পত্রিকাটায় নিদারুণ লাইনগুলো থেকে ভালোদিয়া চোখ ফেরাতে পারছিল না: **'অপরাধী গেনেরালোভ, আন্দ্রেইউশ্‌কিন, অসিপানোভ, শেভিরিয়ভ এবং উলিয়ানভের উপর সেনেটের বিশেষ দপ্তর যে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিল সেটা ১৮৮৭ সালের এই মে মাসের অষ্টম দিবসে কাজে পরিণত করা হয়েছে।'**

ভালোদিয়া কাগজটার উপর দিয়ে হাতখানা দিয়ে একটা ঘষা লাগাল — যেন ঘষে মুছে ফেলে দিতে চায় ঐ লাইনগুলিকে। কথা ক'টার নিদারুণ, ভয়াবহ অর্থটা যেন তার বোধগম্য নয়।

সাশা নেই — তাও কি সম্ভব? সাশা এত বিচক্ষণ, এত সহৃদয়, এত ন্যায়পর — তাকে তারা প্রাণদণ্ড দিল, এটা কি সম্ভব?..

চিৎকার করে উঠতে চাইছিল ভালোদিয়া — তার ইচ্ছে হচ্ছিল যে, ছুটে গিয়ে দাদার হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে তাদের খুন করে।

ওলিয়াও তেমনি রেগে আগুন হয়ে উঠল। কথাটা রয়ে-সয়ে বলবার জন্যে ভালোদিয়া চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষে খবরটা ওলিয়াকে বললে সে মেঝেয় পড়ে গিয়ে জারকে খুন করবে বলে চিৎকার করতে থাকল।

ভালোদিয়া অপলক দৃষ্টিতে খবরের কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইল — লাইনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সে দেখতে পাচ্ছিল প্রিয় ভাই সাশার মুখখানা।

কী করে ঘটতে পারল এমনটা?..

আগে সে আর সাশা চিলেকোঠার নিরিবিলিতে গিয়ে তাদের পড়া বিভিন্ন বই নিয়ে গরম গরম আলোচনা করেছে। সর্বকালে সর্বযুগে বিভিন্ন দেশের মানুষের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম তাদের দুজনকেই মুগ্ধ করেছে। ফরাসী বিপ্লব আর প্যারিস কমিউন সম্বন্ধে সাশার পড়া ছিল বিস্তর। কমিউন সমর্থকদের শেষে কি হয়েছিল সে সম্বন্ধে ভালোদিয়াকে বলতে বলতে সে বলেছিল যে, রাশিয়ায়ও একদিন কমিউন জয়যুক্ত হবে। ভালোদিয়া তখন ভেবেছিল, 'সাশা নিশ্চয় একদিন বিপ্লবী হবে'।

শেষ বার ছুটিতে বাড়ি এসে সাশা চুপচাপ থাকত খুব বেশি সময়, অণুবীক্ষণের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকত — থিসিস তৈরি করবার কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকত। তাকে এই অবস্থায় দেখে দেখে ভালোদিয়া হতাশ হয়ে ভাবত যে, সাশা বিপ্লবী হবে না কোনদিনই।

একদিন একটা নিকুঞ্জে দাদার সঙ্গে ভালোদিয়ার দেখা হয়ে গেল। সাশা সেখানে একা বসেছিল, তার আঙুল জড়াজড়ি করা দু'হাত ছিল হাঁটুর উপর — সে গভীর চিন্তামগ্ন ছিল। তার কোটরে-বসা চোখ দুটোয় ছিল চাপা আগুন। ভালোদিয়া দাদার দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। সাশা বলতে লাগল মা আর বোনদের সম্বন্ধে, বলল ভালোদিয়া যেন সব সময়ে ওদের খুব যত্ন নেয়, তাদের যেন কখনও কোনক্রমে না রাগায়। সাশা আর আনিয়া পিটার্সবুর্গে থেকে পড়াশুনা করে — বাড়িতে থাকে না, কাজেই, ভালোদিয়াই তো পরিবারের কর্তা।

অন্ধকার জানালাটা দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভালোদিয়া মাথার কোঁকড়া চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালাচ্ছিল। সাশা আর বেঁচে নেই, অতি ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটেছে তার — এই উপলব্ধির নিদারুণ যন্ত্রণাটা যেন তার শক্তি নিংড়ে দিচ্ছিল।

...ওলিয়া বৈঠকখানায় কৌচে শুয়ে ছিল। মেঝের উপর পড়ছিল ফালিফালি চাঁদের আলো, তার মাঝে মাঝে পামগাছের কালো কালো ছায়া।

'ঘুমিয়ে পড়েছিস?' ভালোদিয়া জিজ্ঞাসা করল।

ওলিয়া উত্তর দিল না। সে নড়ল না। ভালোদিয়া একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল। তার কম্পিত শিখায় বোনের মুখখানা মনে হল যেন মৃতের মতো ফেকাসে। মুহূর্তের জন্যে তার মনে হয়েছিল ও বুঝি আর বেঁচে নেই।

'ওলিয়া, ওলিয়া, লক্ষ্মীটি, চোখ মেল্!' ভালোদিয়া তার মাথাটা তুলে ধরল।

ওলিয়া একবার কাতরে দাদার বুকে নিজের মুখখানা চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

'সাশা নেই — এখন আমরা কী করব? মার কি হবে? আহা, বাবা যদি বেঁচে থাকতেন!'

'জানি নে এ অবস্থায় বাবার কাটত কিভাবে,' ভালোদিয়া বলল নিজের মনেই।

বোনের তপ্ত অশ্রু জামা ভিজিয়ে তার গায়ে লাগছিল; সে বোনকে বুকে চেপে নিল।

'কিছু বলো না কেন? কী ভাবছ বলো তো?'

'ভাবছি সাশার কথা... আর মার কথা... আর ভাবছি কী করে আমাদের কাটবে।'

চাঁদ আকাশে আরও উপরে এগিয়ে এল — ছায়াগুলো আরও ঘন হয়ে উঠল, ছায়াগুলো সরে গেল জানালার দিকে।

কেঁদে কেঁদে একবারে অবসন্ন ওলিয়া গভীর ঘুমে অভিভূত হয়ে পড়ল। তার মাথার নিচে আস্তে আস্তে একটা বালিশ গুঁজে দিয়ে ভালোদিয়া গেল উপরে সাশার কামরায়।

ডেস্কের উপরে ছিল নানা টেস্ট টিউব আর ফ্লাস্ক। এই ঠুনকো কাচ এবং সাশার অন্যান্য সমস্ত জিনিসপত্র বজায় রইল, কিন্তু সে আর নেই।

ভালোদিয়া ঝুলবারান্দার উপরকার জানালাটা খুলে দিল। কলারের বোতাম খুলে সে তাজা হাওয়ায় নিশ্বাস নিল গভীরভাবে।

তার চিন্তাগুলো সব জট পাকিয়ে গিয়েছিল।

তার কী করা উচিত? জারকে খুন করবে? সাশার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে? লোকের তাতে কোন্ উপকারটা হবে? সন্ত্রাসবাদী গ্রিনেভিৎস্কি ছ'বছর আগে জারকে খুন করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের জায়গায় এল তৃতীয় আলেক্সান্দর, দেশে অবস্থা হল আরও খারাপ, লোকের অবস্থা যা খারাপ হয়ে পড়ল তেমনটা আগে আর কখনও হয় নি; যাকিছু সৎ, যাকিছু প্রগতিশীল সেই সবকেই গলা টিপে মারা হচ্ছিল। বাবার ইস্কুলগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল — যে ইস্কুলগুলোকে তিনি কত কষ্টে স্থাপন করেছিলেন।

রোজ সন্ধ্যায় মা একটা ঘুমপাড়ানী গান গাইতেন। সেই গানের কথাগুলো এখনও স্পষ্ট ভালোদিয়ার কানে বাজছিল:

> ...যুগযুগান্তের রহস্য
> সে তুমিই করবে ভেদ,
> মানুষকে দেবে শক্তি,
> যোদ্ধা হবে সে।

মানুষের জন্যে শক্তি। যোদ্ধা হওয়া চাই। কিন্তু কোথায় নিহিত সে শক্তি? কোথায় তা পাওয়া যাবে! অন্যায়, উৎপীড়ন বিনষ্ট করতে হয় কেমন করে? কেউ একলা তো তা করতে পারে না। অতি বড় সাহসী এক শ' জনেও পারে না। কিন্তু, একই লক্ষ্য সাধনের জন্যে কোটি কোটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার উপায়ই বা কি?

'সাশা, আমি তুলে নেব তোমার মুক্তি মশাল। তোমারই লক্ষ্য নিয়ে আমি চলব — কিন্তু জয়ের জন্যে আমি খুঁজব অন্য পথ। সাশা, তুমি যে লক্ষ্যের সেবা করে গেলে, সেজন্যে আমি উৎসর্গ করব সমগ্র জীবন, সমস্ত শক্তি।'

ভোরের তাজা হাওয়ার একটা দমকে ঘরটা ফলগাছের ফুলের গন্ধে ভরে গেল।

প্রথম বার ওরা যখন বাড়িটা দেখেছিল সেই কথা ভালোদিয়ার মনে পড়ল। ঝোপঝাড়ে ঢাকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে মা ফলের বাগান করবার কথা ভেবেছিলেন। এখন সেটা হয়েছে। কোন গাছে একখানাও মরা ডাল নেই — প্রত্যেকটা গাছ ফুলে ভরে গেছে।

সূর্য উঠছিল। তাতে চেরিগাছের ঝাড়গুলোয় গোলাপী রং ধরছিল, আর ফুল্ল এল্‌ম্‌গাছগুলোর গুঁড়ি হয়ে উঠছিল তামাটে।

গাড়ির চাকার ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ তার কানে এল। একটা ঘোড়ার নাকের ভোঁসভোঁস।

ভালোদিয়া ছুটে নিচে গিয়ে দরজা খুলল। দিদি আনিয়া তার দু'বাহুর মধ্যে এসে পড়ল। মাথার ঢাকনি তুলে, টুপি খুলে মা আস্তে আস্তে উঠতে থাকলেন ক্যাঁচকেঁচে সিঁড়ি বেয়ে। তিনি যাচ্ছিলেন সাশার কামরায়।

'মা আর আনিয়া ফিরে এসেছে!' ওলিয়াকে নাড়া দিয়ে বলল ভালোদিয়া। 'চুল আঁচড়ে নাও, মুখ ধুয়ে এসো, ঠিকঠাক হয়ে যাও। মা যেন আমাদের চোখের জল না দেখেন।'

ছোটদের কামরায় ছুটে গিয়ে সে বলল: 'জলদি! সবাই এসে যাও!' সে মিতিয়াকে জামাকাপড়

পরতে সাহায্য করল, মানিয়াশার চুল বেঁধে দিতে গিয়ে পেরে উঠল না। 'চলো সব — মার কাছে যাব!'

সাশার কামরার দরজার সামনে ওরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। বালিশে মুখ গুঁজে মা শুয়ে ছিলেন।

'মা!' ভালোদিয়া ডাকল আস্তে।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা সাড়া দিলেন না। ভালোদিয়া কনুই দিয়ে একটু ধাক্কা দিয়ে মানিয়াশাকে ইঙ্গিত করল। সে গিয়ে খাটে উঠে মার গলা জড়িয়ে ধরল।

'ফেরো আমার দিকে — মা গো!'

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা উঠে বসে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখের উপর দিয়ে ক্ষীণ হাসি খেলে গেল।

সবাই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল — তাদের চোখে বেদনা আর ভালবাসা, তাদের চোখ যেন বলছিল: 'তোমাকে যে আমাদের বড় দরকার। আর তোমারও দরকার আমাদের।'

'চলো সবাই নিচে গিয়ে সকালের খাবার খাওয়া যাক,' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন ছেলেমেয়েদের; ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর সেই সব সময়কার মতো সূক্ষ্ম গলার আওয়াজ।

ম. শাগিনিয়ান

ইতিহাসের পরীক্ষা

(একাংশ)

আজ ইস্কুলে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাগুলোর একটা—ইতিহাসের পরীক্ষা। ইতিহাসের শিক্ষক ছাত্রদের কাছে চান খুব বেশি; পরীক্ষার জন্যে তিনি যেসব প্রশ্ন তৈরি করেছেন তার প্রত্যেকটাতে একটা করে প্যাঁচ। অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পাঠ্যপুস্তকে যা আছে তার চেয়ে বেশি জানা দরকার — যেমন ৪র্থ চার্লস্ সংক্রান্ত প্রশ্নটি। তার মানে হল শিক্ষক ক্লাসে যা বলেছিলেন সেটা মনে রাখা চাই, নইলে প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্যে রেফারেন্স্ বই ঘাঁটতে হবে। ছেলেরা অনেকে ভালোদিয়া উলিয়ানভের কাছে উত্তরটা জানতে চাইত, কেননা, সব সময়েই উত্তরটা তার জানা থাকত, কিন্তু আজ তারা ওকে জিজ্ঞাসা করল না। ভালোদিয়ার মনে হচ্ছিল যে, তার উপর ওদের নাছোড় দৃষ্টি যেন আঠার মতো লেগে আছে — সেগুলোকে দেখাই যাচ্ছিল যেন হুলওয়ালা পোকার মতো।

ভালোদিয়া উলিয়ানভ সেদিনও ইস্কুলে গেল, বইগুলোর বাঁধন খুলল, চামড়ার পটিটা আঙুলে জড়াল -- সব সময়ে এটা করত। বসলও অন্যান্য দিনেরই মতো। ওর মুখখানা খুব ফ্যাকাসে ছিল, তা ঠিক। ওর দাদা আলেক্সান্দরের ফাঁসি হয়েছে—তাই নিয়ে সবাই বলাবলি করছিল। শিক্ষিকা ভেরা ভাসিলিয়েভ্‌না কাশ্‌কাদামোভা ওদের পরিবারের বন্ধু — তিনি ঐ সংবাদসহ একখানা চিঠি পেয়েছিলেন, আর ভালোদিয়া সে সম্বন্ধে জানত, এই বলে গুজব রটেছিল। একজন বলল, চিঠিখানা পড়ে ভালোদিয়া বলেছিল: 'না, আমাদের চলার পথ এটা নয়।'

গন্তব্য কোথায়? কোন পথে? ছোট শহরে সবাই সব সময়ে সবার ব্যাপার জানে।

এদিকে ভালোদিয়া নিজের উপর সহপাঠীদের দৃষ্টি অনুভব করছে — সেই সময়ে কাগজের মতো ফ্যাকাসে মুখে তার বোন ওলিয়া মেয়েদের ইস্কুলে ফরাসী ভাষার মৌখিক পরীক্ষা দিচ্ছিল। স্পষ্ট, দৃঢ় গলায় সে কথা বলছিল। তবে, ছেলেদের চেয়ে বেশি কৌতূহলী হলেও মেয়েরা অপেক্ষাকৃত বেশি সহৃদয়। সেদিন অবধিও ওলিয়া ছিল হাসিখুসি, সবার প্রিয় — এখন সে নিরুত্তাপ, নিষ্প্রাণ। সে যেন রাতারাতি অনেক বড় হয়ে গেছে। যখন-তখন কোন মেয়ে এসে ওর হাতে আলতোভাবে চাপ দিয়ে যাচ্ছিল।

উলিয়ানভের আগে পরীক্ষকের টেবিলে গেল তলস্তয় নামে একটি ছেলে। প্রশ্নগুলোর গাদা থেকে একটা তুলে নেবার সময়ে তার আঙুল কাঁপছিল। সে উত্তর বলল থেমে থেমে, পেল মাঝারি নম্বর।

তারপরে ডাক পড়ল ভ্লাদিমির উলিয়ানভের। যেন অদৃষ্টের পরিহাস: ইতিহাসের শিক্ষক যে প্রশ্নপত্র তৈরি করেছিলেন তার একটিতে ছিল বিভিন্ন ঐতিহাসিক কালপর্যায়ের বিপ্লব আর শ্রেণী-সংগ্রাম নিয়ে।

প্রথম প্রশ্নটা ছিল রোমক প্রলেতারিয়ানদের সম্বন্ধে — পর্বতে গিয়ে তারা নিজেদের অধিকারের জন্যে লড়েছিল গর্বোদ্ধত রোমক অভিজাতদের বিরুদ্ধে। তাদের শ্রেণীর পক্ষে যমদূতের মতো ৪র্থ চার্লস-এর নামও ছিল প্রশ্নপত্রে। ভালোদিয়ার কাছে এটা আর শুধু পরীক্ষা ছিল না। বাঁচবার, শিক্ষা পাবার, বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবার অধিকারের ক্ষেত্রে তাকে পরীক্ষা করছিল ম্লান গম্ভীর মুখের মানুষগুলি, তার সহপাঠীদের কৌতূহলী ভয়ার্ত দৃষ্টি, জমিওয়ালা অভিজাতদের সেই ঝিম ধরা গোটা পুরনো শহর সিম্‌বির্স্ক। ভালোদিয়া যেন প্রলেতারিয়ান — রোমের উপরে মাথা তোলা পর্বতে সে একা। ৩৩

গতকালও সে ছিল ক্লাসে অন্য যেকোন ছেলেরই মতো। আজ সে ফাঁসিতে নিহত একজনের ভাই — নিঃসঙ্গ, কুষ্ঠরোগীর মতো মণ্ডলী থেকে বর্জিত, প্রথম আজ সে বুঝতে পারছে ঐ মণ্ডলীটা আর তার ভিতরকার নানা বাধ-বৈষম্য কত বাস্তব।

ঐ বাধ-বৈষম্যগুলোকে দূর করে দিতে, সমস্ত মানুষকে সমান করতে চেয়েছিলেন তার দাদা। কিন্তু, তার দাদা ছাড়াও আরও অনেকেও সেটা করতে চেয়েছেন। প্রশ্নগুলি সে খুঁটিয়ে পড়ল: রোমক অভিজাতদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম, রিফর্মেশন, বগদান খ্‌মেলনিৎস্কি। সমগ্র ইতিহাস সংগ্রামে ভরা। কিন্তু তার ভাইয়ের মতো একলা লড়াই চালানো তার জবাব নয় — সেটাতে মীমাংসা নয়।

ভ্লাদিমির উলিয়ানভ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে আরম্ভ করল। সে বলল স্পষ্ট করে, শান্তভাবে। তার 'র'-এর উচ্চারণটা কণ্ঠ্য ছিল।

শিক্ষক আনমনে কাগজে এক নকশা কেটে কেটে সর্বক্ষণ অনুমোদনসূচক মাথা নাড়ছিলেন, আর পরীক্ষকেরা এ ওর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন: ছেলেটি বলছে এত চমৎকার — কোথাও প্রশ্ন করবার কিছু নেই। ইস্কুলের পরিচালক মোটাসোটা বৃদ্ধ কেরেনস্কির ছেলে (পরে যিনি হলেন রাশিয়ায় অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী) শিগগিরই প্রথম শ্রেণীতে উঠবে — এই বৃদ্ধ সম্মতিসূচক ভঙ্গি করছিলেন মনে মনেও: উলিয়ানভকে সোনার মেডেল পুরস্কার তো দিতেই হবে, যদিও অবস্থা যা তাতে তাকে এমন পুরস্কার দেবার ঝুঁকিও আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর গত্যন্তর নেই — কেননা, ক্লাসের মধ্যে উলিয়ানভ আর সবার চেয়ে ঢের ঢের বেশি শ্রেষ্ঠ।

তখন তরুণ লেনিন ভাবছিলেন কী? তিনি ইতোমধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন দুটি জীবন — যেমনটা সচরাচর দেখা যায় না; তখনকার রুশ সমাজের বৈশিষ্ট্যনির্দেশক প্রতীকস্বরূপ এই দুটি জীবন। বিপ্লবের কোন চিন্তা কখনও তাঁর বাবার মাথায় আসে নি — তিনি শান্তিপূর্ণ সাংস্কৃতিক কর্মের পথ বেছে নিয়েছিলেন। দেশের মানুষকে জ্ঞানালোকিত করবার কাজে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু, তিনি নিজের ভাবাদর্শ পদদলিত হতে দেখে গেলেন; অত প্রচেষ্টায় তিনি যে ইস্কুলগুলি গড়েছিলেন সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল: গ্রামে গ্রামে জ্বলতে আরম্ভ হয়েছিল

যে ক্ষীণ আলো সেটা আবার গেল অন্ধকারের গ্রাসে। তাঁর বাবার পথ একটা কানাগলিতে গিয়ে শেষ হয়ে গেল।

তাঁর প্রিয় ভাই বেছে নিয়েছিলেন সন্ত্রাসবাদের পথ: জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে একলা লড়াইয়ের পথ। এই পথ ঘটাল তাঁর নিরর্থক অকালমৃত্যু।

না, এসব পথে জয় হবে না—জনগণের সুন্দর জীবন আসবে না। শৈশব থেকে যে ভাইকে তিনি এত ভালবেসে এসেছেন তাঁর জন্যে লেনিনের পরিবারের কেউ কিংবা কোন বন্ধুবান্ধব ভালোদিয়া উলিয়ানভকে কাঁদতে দেখে নি... তবু, কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-সভায় তাঁর

উচ্ছ্বাসের যে বর্ণনা পাওয়া যায় পুলিসের সংক্ষিপ্ত নিরস বিবরণে সেটা পড়লে, শেষ পরীক্ষায় তিনি যে বিপুল আত্মসংযম দেখিয়েছিলেন সে কথা না ভেবে পারা যায় না। ছাত্র হিশেবে ভ্লাদিমির উলিয়ানভ যখন গিয়ে পড়লেন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের দুর্দান্ত জ্বালাময়ী আবহাওয়ার মধ্যে তখন তাঁর মাঝে জেগে উঠল বিপ্লবের মহাপ্রতিভা।

ল. রাদিশ্চেভ

বেয়ে চলো!

গরমের দিনে সওদাগরের জেটিতে বসে চা খাবার রেওয়াজ ছিল, জায়গাটা সুবিধের — সেখান থেকে চারিদিকে নজর রাখা যায়। একটা চাঁদোয়ার নিচে তার জন্যে একখানা ছোট টেবিল পেতে দেওয়া হল — সেই টেবিলে সামোভার ধোঁয়া ছাড়ছিল, তার পাশে ছিল ঝকঝকে শাদা একটা চায়ের পাত্র, আর ওদিকে, সওদাগরের বসর জায়গা থেকে কয়েক ফুট দূরে রোদে ঝলমল ভলগা বয়ে চলল ধীরে, রাজসিক চালে।

যেমন সব সময়ে তেমনি আজও সে বসেছে তার প্রিয় জায়গাটায়। একটি খানশামা ছেলে টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে গেছে চকচকে তামার সামোভারটা, জেটিটা দুলছে ধীরে, বাঁকানো ধূমনালীওয়ালা একখানা স্টীমার ধোঁয়ার মেঘ ছড়িয়ে দিল। একখানা বজরায় মাঝিমাল্লাদের তাড়াহুড়া; গরমে অবসন্ন একদল যাত্রী ধীরে ধীরে চলেছে জেটির দিকে।

'ডিঙিগুলোর ওখানে দিয়ে যাচ্ছিলাম, কর্তা, দেখলাম একজন নদী পার হতে চাইছে।' টেবিলের কাছে এসে একজন নাবিক বলল, 'সে বলে তার তাড়া আছে — বজরার জন্যে দেরি করবার সময় নেই। মাঝিরা তো বুঝতেই পারে না কী বলবে, কিন্তু লোকটা বলেই চলেছে: কাউকে পার করতে মানা করবার কোন অধিকারই তার নেই। নদীটা তো তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।'

'ব্যস্?' মুখও না ফিরিয়ে সওদাগর বলল। 'একটু চাঙ্গা হও তো!'

একটু দূরে নদীর কিনারায় আলকাতরা মাখা এক সারি ডিঙি — সেখানে বুক-খোলা গ্রীষ্মের শার্ট পরা এক যুবক ভলগার এক মাঝির সঙ্গে জিদ ধরে কথা বলছে। মাঝিটির পাকা গোঁফ, তার মুখে সব গভীর বলিরেখা।

'কাউকে নৌকো করে নদী পার করে দিলে কেউ আপনাকে মানা করতে পারে না, এটা বুঝতে পারছেন না কেন? এমন কোন আইন নেই — আমাদের দেশেও না!' শেষ কথাটি জুড়ে দিতে দিতে যুবকটির চোখে কৌতুকের ঝিলিক খেলে গেল।

'সেটা আমাদের এক্তিয়ারে নয়, কর্তা,' বলল সেই পাকা চুল লোকটি। 'সে জেটির ইজারাদার, আর সেই শহরে খাজনা দেয় — সেই হল আইন!'

যুবকটি ভ্রূকুটি করল।

'সে পারঘাট ইজারা নিয়েছে — সেটা তার ব্যাপার, কিন্তু অন্য কেউ সওয়ারী নিলে সে মানা করতে পারে না। এই তো সোজা কথা? আপনি তার বিরুদ্ধে মামলা করতেও পারেন!'

পাকা চুল মানুষটি বিড়ির টুকরোয় থুথু ফেলল, কিন্তু বিড়িটা জলে ফেলল না (ভলগার জল যে পবিত্র!)...

'ও হল এখানকার টাকার কুমির — জজ্‌দেরও সে কিনে নিতে পারে। সবাই তার পক্ষে। জানেন না, কথায় বলে, জোর যার মুল্লুক তার?'

'সেটা তো ঠিক নয়!' তরুণটি জিদ ধরে বলল। 'ও আপনাদের ভয়ে কাঠ করে রেখেছে। আইন ডিঙিয়ে ও নিজেই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেছে। এর জন্যে কোন প্রমাণই দরকার হয় না। ওর নামে মামলা করে দিলে তারা ওকে শাস্তি না দিয়ে পারবে না!'

পাকা গোঁফ মানুষটি শুধু ঘাড় কুঁচকাল — বলল না কিছু। জীর্ণ টুপি মাথায় আর একজন মাঝি একবার এ পা আবার ও পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে শুনছিল, আর অনিশ্চিতভাবে তাকাচ্ছিল জেটির দিকে।

'কী বলেন?' জিজ্ঞাসা করল যুবকটি।

'ও আমাদের ফেরাবে নিশ্চয়ই, সেটা জানা কথা।' মাঝি বলল ইতস্তত ক'রে।

'তবু যাওয়া যাক — ও দেখুক না চেষ্টা করে!' এই ব'লে যুবকটি মাঝির উত্তরের জন্যে আর দেরি না করেই নৌকোখানাকে নদীর মধ্যে ঠেলে দিয়ে, টাল সামলে নৌকোয় লাফিয়ে উঠে হালের কাছে গিয়ে উঠল। মাঝিও জলের মধ্যে কয়েক পা এগিয়ে নৌকোয় চড়ে গেল। এমন কাজে ফেঁসে গিয়ে যেন অবাক লেগেছে এমনভাবে সে মাথা নাড়ছিল। দাঁড়ের বাঁধনিতে টিকটিক আওয়াজ হতে থাকল; জল আস্তে আস্তে আছড়ে পড়তে থাকল দাঁড়ের উপর। যাত্রীটি সামনের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিল। ভূমিষ্ঠ হবার পরে একবারে প্রথম দিনগুলি থেকেই সে এই নদীর সমগ্র বিপুল সৌন্দর্য দেখে আসছে, কিন্তু এ দৃশ্য দেখে দেখে চোখের যেন পরিতৃপ্তি আসে না কিছুতেই। নৌকোখানা চলছিল দ্রুতই — ওরা বেশ কিছুটা দূর পার হয়ে এসেছিল, কিন্তু ও কূল তখনও যেন সেই তত দূরেই রয়ে গেল। মাঝি হঠাৎ জলে দাঁড়ের ঝাপ্টা মেরে চিৎকার করে ক্রুদ্ধস্বরে বলল:

'এই তো ব্যাপার! আপনি তাকিয়ে আছেন ভুল দিকে! পিছন ফিরে জেটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন!'

ওরা দেখতে পেল একজন দাড়িওয়ালা লোক, তার লম্বা শার্টটা জ্যাকেট ছাড়িয়ে নেমেছে, সে জেটির কিনারা অবধি এগিয়ে মুখে দু'হাত লাগিয়ে চিৎকার করছে:

'হো-হো-হো! ফেরো, ফে... রো!'

যুবকটি জিজ্ঞাসা করল:

'গলা ফাটাচ্ছে — লোকটা সেই বুঝি?'

'আবার কে! সে-ই। শোনো একবার ষাঁড়ের চেঁচানি! সেই এখানকার কর্তা!' তিক্ত হেসে মাঝি বলল, 'ওর সঙ্গে আমরা পাল্লা দেবো? সবাই তো যায় বজরায়, কিন্তু ও একটা পয়সাও রোজগার করতে দেবে না আমাদের। আর, ও যা করবে সেটাই ন্যায্য। সব ক্ষমতা ওর হাতে!'

জেটির লোকটা হাত নেড়ে ওদের ইসারা করছিল।

'হেই! কালা নাকি? ফেরো, বলছি!'

'এগিয়ে চলুন!' বলল যুবকটি — তার চোখ দুটো তখন দুটো কালো ফাটলের মতো। 'আহা, আপনার আর এক জোড়া দাঁড় যদি থাকত!'

'কোন লাভ নেই,' গোমড়া মুখে বলল মাঝি। 'দেখুন না, খেল্ শুরু হচ্ছে। দেখুন, কেমন ভিড় জমে গেল — লোক আসছে চার দিক থেকে।'

'তাতে কী হয়েছে? বেয়ে চলো!'

এই দৃঢ় নির্দেশ অনুসারে মাঝি বেয়ে চলল। ওরা মাঝ নদীতে পেঁছেছে, এমন সময়ে স্টীমারের ধূমনালীর উপরে এক টুকরো ধোঁয়ার মেঘ উঠল। একটা তীক্ষ্ণ জোরালো সিটি পড়ল। বজরার লোকটা দড়ার প্রান্তটা ধরল, আর ছোট স্টীমারখানা বেশ সতেজে ছেড়ে দিল — তার পিছনে পড়ে রইল সারি সারি আন্দোলিত ঢেউ। মাঝিমাল্লারা সব আঁকশি তুলে ধরে দাঁড়িয়ে গেল — যেন শত্রুর জাহাজে চড়াও হবার জন্যে তৈরি সব জলদস্যু। আর সবারই মতো খালি পা, প্যাণ্ট গোটানো, কিন্তু শাদা নাবিক-টুপি পরা একজন, বোঝাই যায় ক্যাপ্টেন — সে ফ্যাসফেসে গলায় হুকুম দিচ্ছে: ৩৭

'ডাইনে চালিয়ে যাও! চালাও পুরো দমে!'

স্টীমার আর পলাতকদের মধ্যে ব্যবধান যখন মাত্র কয়েক গজ তখন ক্যাপ্টেন ষাঁড়ের মতো গর্জে বলল:

'ফেরাও! থামাও!'

ইঞ্জিন পাল্টে ঘুরে থেমে গেল। স্টীমার তখন ডিঙিখানার একরকম পাশাপাশিই এসে গেল। কয়েকটা লগির আঁকড়া নৌকোখানাকে আটকে ধরল।

কড়া গলায় ক্যাপ্টেন বলল:

'এখানে সওয়ারীকে নদী পার করায় মানা আছে। পাটাতনে উঠে আসুন!'

'আমাদের বাধা দেবার কোনো অধিকার আপনাদের নেই,' বলল যুবকটি। 'এজন্যে আপনাদের আসামীর কাঠগড়ায় উঠতে হবে।'

'সে আমাদের ব্যাপার নয়। আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। আমরা কর্তার ইচ্ছেয় কাজ করছি! পার হতে চান তো স্টীমারে উঠে আসুন। ডিঙিখানাকে আমরা আর একটুও এগোতে দেবো না।'

যুবকটি মাঝিকে ভাড়া দিয়ে স্টীমারে উঠে একখানা নোটবই বের করে স্টীমারের মাঝিমাল্লাদের নাম জিজ্ঞাসা করল।

'তা দিচ্ছি সানন্দে,' ক্যাপ্টেনটি বলল নির্লিপ্তভাবে। 'লিখে নিতে পাবেন যা খুশি সব।'

যাত্রীটিকে জেটিতে ফিরিয়ে নেওয়া হলে সওদাগরটি তার কাছে এসে মুরুব্বিয়ানা চালে হেসে বলল:

'অত ঝামেলার মধ্যে যান কেন, মশাই! যথেষ্ট সওয়ারী হলেই আমরা আপনাকে ওপারে নিয়ে যাব — যেমনটা উচিত। ইতোমধ্যে বরং মধু দিয়ে একটু চা আর বান্ খাবেন, আসুন।'

চা খেতে বলার কথাটা সওয়ারীটির যেন কানেই ঢোকে নি।

'আপনি যে বললেন 'যেমনটা উচিত', সেটা কে বলে দেবে?'

'আমি বলছি!' সওদাগরের মুখে তখনও মুচকি হাসি। 'আমি পারঘাট ইজারা নিয়েছি — আমি এখানে কোন পাল্লাপাল্লি চাই নে। তাই আমি ওটা করতে দেবো না! কি, একটু চা খাবেন না? বেশ, সে আপনার মর্জি।'

তল্পিতল্পা নিয়ে সব লোক আসতে থাকল। মাল বোঝাই কয়েকখানা ঘোড়ার গাড়িও ছিল। শেষে, মাঝিমাল্লারা তক্তা পেতে দিলে সওয়ারীরা বজরায় উঠতে আরম্ভ করল। স্টীমারখানা সিটি দিয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকল। তখন উঁচু পাড় থেকে কয়েক জনের হাকডাক শোনা গেল। এরা দেরিতে এসেছে — এখন তারা হাত নাড়তে নাড়তে আর পায়ে লাল ধুলো উড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আসছে। ক্যাপ্টেন তাদের জন্যে অপেক্ষা করল — কেননা, পয়সাদেনেওয়ালা সওয়ারী কর্তার হাতছাড়া করবার কোন অর্থ হয় না।

শেষে তার হুকুম হল — 'ছাড়ো!'

ছোট স্টীমারখানা হাফ ছেড়ে বজরাখানাকে টেনে নিয়ে চলল।

সওদাগর তার টেবিলে ফিরে গেল। খানসামা ছেলেটি এক কড়াই গনগনে কয়লা এনে দিল সামোভারে। সওদাগরের পরিচিত একজন ক্ষুদে রাজকর্মচারী এল তার টেবিলে। সে ঐ তাড়া করে যাওয়াটা দেখেছিল — এখন তাই নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিল।

পিরিচে ঢালা গরম চায়ে ফুঁ দিয়ে সওদাগর বলল:

'ছেলেটা একটু মেজাজী!'

শিষ্টাচারে চামচ থেকে একটু একটু চা খেতে খেতে অন্য লোকটি বলল, 'আজকাল অমন দেখা যাচ্ছে বিস্তর। কিন্তু এরা নিতান্তই বাজে। শুধু কিছুটা গরম ভাপ মাত্র! জলে প্রত্যেকটা ক্ষুদে ঢেউ উঠতে চায় আরও উঁচুতে, কিন্তু ঘা খায় জেটিতে — তাতেই খতম।'

একটু পরেই ডিঙিখানা আর তার সেই সওয়ারীর কথা ওদের আর মনে থাকল না — ওরা কথা বলতে থাকল শহরের হালনাগাদ খবরাখবর আর গল্পগুজব নিয়ে। এক সময়ে যে সেই ঘটনাটা হয়ে উঠবে গোটা শহরের আলোচ্য বিষয়, সেটা ওরা কল্পনাও করতে পারে নি।

বেসরকারীভাবে সওদাগর জানতে পারল যে, সামারায় তার বিরুদ্ধে একটা মামলা রুজু হয়েছে; সে আইন ডিঙিয়ে কাজ করেছে ব'লে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে — এইভাবে হল ব্যাপারটার শুরু। কী যে ব্যাপার সেটা সওদাগর ভাবতেই পারে নি। বহু কাল হল সে কারবার চালাচ্ছে, বহু অসাধু কাজ কারবার থেকেই সে শট্‌কে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু এমনটার মধ্যে পড়ে নি কখনও। সে শুনল অভিযোগটা কী, আর শুনল যে, সামারায় প্র্যাক্‌টিস্‌ করে এক ব্যারিস্টারের সহকারী, নাম উলিয়ানভ — সে ঐ মামলা রুজু করেছে। তখন সেই তরুণ দৃঢ় মুখখানা আর সেই প্রখর চোখ দুটো তার মনে পড়ল। জেটিতে ঢেউয়ের ঘা খাবার কথা বলেছিল তার বন্ধু, সে কথাটাও তার মনে পড়ল। মনে মনে হেসে সওদাগর বলল আপন মনে: 'কী বোঝো! ছোকরা ভাবছে ভয় খাওয়াবে আমাকে!' একটা হাঘরে মাঝির ব্যাপারে তাকে সত্যিসত্যিই গিয়ে আদালতে হাজিরা দিতে হবে, এটা তার যেন বিশ্বাসই হয় না।

বেসরকারীভাবে সে আরও শুনেছে যে, মামলাটা তেমন গুরুতর না হলেও, যথেচ্ছাচার

সংক্রান্ত আইন এতে খাটে, আর এতে সাজা হলে এক মাস জেল খাটতে হয়, তার বদলে জরিমানা দিয়ে খালাস পাওয়া যায় না। ফ্যাসাদ এড়াতে হলে তার উকিল নিয়োগ করাই ভাল।

সে যে উকিলের কথা শুনেছিল তাকে দেখে অভিজ্ঞ লোক বলেই মনে হল — একবারে যাকে বলে ফেরেববাজ। তার গায়ে ছিল জীর্ণ কোট, আর নস্যি নিচ্ছিল। মক্কেলকে সে বলল মামলাটা ক্ষুদে ব্যাপার, কিন্তু একটু অপ্রীতিকর — কেননা, স্বেচ্ছাচার স্বতঃপ্রতীয়মান, তাই তার উল্টোটা প্রমাণ করতে আদালতের বেগ পেতে হবে। তবে, তিনি বললেন, ঈশ্বর করুণাময়।

তিনি উকিল নিয়োগের টাকা পেয়ে আদালতে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়লেন। মামলা চলছিল আসামীর বসত শহরে — অনেক দূরের একটা এলাকায়। স্থানীয় জজের দপ্তরে গিয়ে এই উকিল দেখল যে, ফরিয়াদী যুবক আগেই এসে গেছে—তাকে উকিল সবিনয়ে নমস্কার জানালো:

'আপনি দেখছি এসেছেন সেই সামারা থেকে। এখান থেকে বেশ দূর বটে। আমার মনে হয়, এক শ' মাইল তো হবেই—তার উপর আমাদের রাশিয়ায় রাস্তাঘাটের যা অবস্থা!'

তরুণটি বলল, তা দূরই বটে, কিন্তু সে আর আলাপ চালালো না। একটু পরেই জজের এজলাসে ওদের ডাক পড়ল। জজকে দেখতে বেশ জমকাল — তার চোখের কোলে কোলে সম্ভ্রান্ত ধরনের কালো রেখা। অভিযোগটা প'ড়ে জজ বলল যে, ব্যাপারটা তুচ্ছ — এটা দু'পক্ষ মিলে আদালতের বাইরেই ফয়সালা করে নিক। এই তরুণ আইনজীবীটি ঢালাওভাবে বলল যে, কি এখন, কি পরে, কখনও আদালতের বাইরে ফয়সালা করতে সে রাজি নয়; মামলা চালাবার জন্যেই সে দাবি জানালো। একটু পরেই জজ সিদ্ধান্ত জানালো যে, মামলাটা মুলতবি থাকছে — কেননা, কয়েকটা বিষয় আগে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

শহরে ফিরে সওদাগরের উকিল ঘটনার বিবরণ জানালো তার মক্কেলকে। ব্যাপারটা সওদাগরের বড় গোলমেলে লাগছিল। সে দাড়িতে টান মারতে মারতে কয়েক বার কথার মধ্যে কথা তুলে বলল:

'লোকটা এত কষ্ট করছে কিসের জন্যে? আমাকে মেরে ফেললেও আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি নে: আপনি যথাসাধ্য করছেন, তার কারণ আমি আপনাকে মোটা টাকা ফী দিচ্ছি, সেটা না দিলে আপনি আমার জন্যে কিছুই করতেন না — বলুন, ঠিক কিনা? কিন্তু সে এতে নিজের টেঁকের পয়সা খরচ করছে, তার উপর যাওয়া আসায় সময়ও তার নষ্ট হচ্ছে ঢের। কিসের জন্যে? বলতে পারেন — কিসের জন্যে?'

'বয়স কম — সে কাঁচা!' এই বলে উকিল ঘাড় কোঁচকালো; 'সে উচ্চাভিলাষী। কেউ কাউকে পথ ছাড়বার পাত্র নয়। জজের কাছে সে উচিত শিক্ষাই পাবে! মামলা উঠতে দেরি হবে অনেক!'

উকিলটি বুঝেশুঝেই কথা বলছিল।

শরৎকালের শেষের দিকে—তখন ভলগার জল ঠাণ্ডা, নদীর ঠাণ্ডা দুই পাড় যেন নিষ্প্রাণ, এমন সময়ে এক বৃষ্টি বাদলা দিনে উভয় পক্ষের কাছে সমন গেল।

সওদাগরটি এবার তার উকিলের ফিরে আসার জন্যে মহা বিরক্ত হয়ে অপেক্ষা করছিল।

'জজ মামলাটাকে আবার মুলতবি রেখেছেন,' ফিরে এসে উকিল প্রথমেই বলল এই কথা। সে উল্লাসে হাত কচলাচ্ছিল। 'জজ ঠিক কাজের লোক। তিনি একটা ফাঁক খুঁজে পেয়েছেন।

তবে, যুবকটি একেবারে অসহ্য, তা বলছি,' উকিলটির গলার স্বরে একটা অদ্ভুত শ্রদ্ধার রেশ। 'সে এলো ভিজে জবজবে, জামাকাপড়ে কাদার ছাপ। জানেন তো আজকাল সামারার রাস্তার কী হাল! সেই মহাপ্লাবনের চেয়ে খারাপ অবস্থা! কিন্তু ওর যেন তাতে ভ্রূক্ষেপই নেই। আদালতের বাইরে ফয়সালা করবার জন্যে জজসাহেব আবারও বলেছিলেন, কিন্তু সে নারাজ। কিছু ভাববেন না — আর কয়েক খেপ আদালতে আসতে হলেই তার মত বদলে যাবে। ওকে আমরা হয়রান করে ছাড়ব। শিগগিরই কেটে পড়বে!'

সওদাগর চুপ করে রইল। তার বড় অদ্ভুত লাগছিল — যেন রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ পাথরের মতো শক্ত একটা অদৃশ্য বস্তুতে তার মাথা ঠুকে গেছে।

সময় যায়।

ভলগা বরফে ঢেকে গেছে। মনে হয় যেন এখন যা হল এই বিপুল বিস্তীর্ণ শ্বেত প্রান্তর এখান দিয়ে যেন কেউ কখনও নৌকো বেয়ে যায় নি, যেন কোন দিন কোন বজরাও ছিল না, আর জেটিটাকে দেখে তো রূপকথার বরফের বাড়ি ছাড়া কিছু মনে হয় না।

নববর্ষের কয়েক দিন আগে সহকারী ব্যারিস্টার ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ স্থানীয় জজের কাছ থেকে একটা সমন পেলেন। মামলাটার কথা তাঁর পরিবারের সবাইও জানত। বাড়িতে একজন অতিথি এসেছিলেন—তাঁর সঙ্গে তিনি দাবা খেলছিলেন, তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর মা উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছিলেন যে, তাঁর ছেলেকে আবার সেই রাত জেগে ট্রেনে করে, ঘোড়ার গাড়ি চেপে, পায়ে হেঁটে যেতে হবে সেই পৃথিবীর আর এক প্রান্তে। তিনি জানতেন যে, বলে-কয়ে ছেলের মত বদলাবার চেষ্টা করে কোন কাজ হবে না, তবু কথাটা না বলে পারলেন না:

'ভালোদিয়া, আমার ইচ্ছে সওদাগরের বিরুদ্ধে মামলাটা তুমি ছেড়ে দাও! যাওয়া আসা করতে করতে তুমি শুধু হয়রানই হবে।'

'না, মা, আমার যেতেই হবে,' দাবার ছক থেকে চোখ তুলে তিনি বললেন। 'মামলাটার শেষ আমি দেখবই। এমন সুযোগ চলে যেতে দিতে পারি নে। যতবারই মুলতবি রাখুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাদের দণ্ডাদেশ দিতেই হবে। গোটা শহর সব জানবে, শত শত লোকে সব শুনবে — সেটা হবে চমৎকার শিক্ষা!.. জজ যে কী করছেন সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি: গত্যন্তর নেই বলে তিনি যতখানি সম্ভব দেরি করিয়ে দিচ্ছেন, যতদিন সম্ভব মুলতবি রাখছেন। আর তোমারও গত্যন্তর নেই,' মুচকি হেসে তিনি প্রতিপক্ষকে বললেন, 'কিস্তিমাত! কিন্তু জজ আমাকে নিরস্ত করতে পারবেন না। রাতের ট্রেনে যেতে হবে—শুধু এই যা মুশকিল।'

*

বসন্ত এল। স্ফীত নদীর জলে ভেসে ভেসে চলেছে গলমান বরফ, ভাসমান বরফ চাঙড়গুলোর মধ্যে ঠোকাঠুকি লাগছে; নদীর বুকে বরফমুক্ত স্বচ্ছ জলের এলাকা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। প্রত্যেকটা খানার জলে এক এক টুকরো সোনালী সূর্য, আর ভিজে মাঠ থেকে বাষ্প উঠছে। নৌচলাচল তখনও আরম্ভ হয় নি। স্টীমারগুলো ভাঙা গলায় পরস্পরকে ডাকাডাকি করে গলা

পরিষ্কার করে নিচ্ছিল; খাতগুলোতে আর জেটিগুলোর চারপাশে লোকে বরফ কাটছে — তবে, খেয়া চলাচল আরম্ভ হয়ে গেছে।

ছোট ছোট নৌকার বিরাট বহর সওয়ারী নিয়ে চলাচল করছে। রয়েছে বড় বড় মাছ ধরা নৌকা আর ছোট্ট ছোট্ট সব ডিঙি। যেখানেই লোক জড়ো হচ্ছে, সবার মুখে সেই একই কথা — জেটির মালিক সেই সওদাগরের কথা, সে এখন জেল খাটছে।

জীর্ণ টুপি পরা সেই মাঝির মনে হয় সে যেন এক নায়ক। সে তার সেই সওয়ারীর গল্প বলেছে এক শ' বার — তার চেয়ে একবারও কম নয়। আর প্রতি বারই সে কাহিনীতে জুড়ে দেয় নতুন কিছু।

'আমাদেরই একজন — তিনি ভলগা এলাকার মানুষ, সেটা তাকে দেখলেই বোঝা যায়। এখনও তিনি জোয়ান ছেলে, কিন্তু গায়ে গতরে প্রকান্ড, আর তাঁর গলার আওয়াজ যেন বাজের গর্জন। তিনি যখন বললেন 'বেয়ে চলো', তখন আমার দাড় চলতে আরম্ভ করল আপনা থেকেই!'

'দাঁড়াও, সওদাগর জেল থেকে বেরুলে কী হয় দেখ। সে লাগবে তোমার পিছনে। তখন তোমাদের অনুশোচনা করতে হবে।'

কথা শুনে সেই মাঝি হাসে।

'আরে না, না! তার গলা দিয়ে গ্রাস নামছে না। ফের জেলে যেতে চাইবে না। আর যদি ফের তার মাথায় অমন কিছু আসে, তাহলে আমরা...' মাঝি গভীরভাবে শ্বাস টেনে গাঁ-গাঁ করে বলে, 'পাল্টা চালাও! রোখো!'

ম. প্রিলেঝায়েভা

শীতে একদিন

এই কাহিনীর ঘটনাগ‍ুলো ঘটেছিল গত শতকে পিটার্সবুর্গে: জারের আমলে লেনিনগ্রাদের ঐ নাম ছিল। ভ্লাদিমির ইলিচ তখন সেখানে থাকতেন।

শীতকালে একদিন ভ্লাদিমির ইলিচ গেলেন প‍ুতিলভ কারখানা দেখতে। তাঁর জানা একজন ইঞ্জিনিয়র ম্যানেজারকে বললেন যে, একজন পন্ডিত লোক এসে ঘ‍ুরে ফিরে সব দেখতে চাইছেন।

কারখানার আপিসে একজন কেরানী এই পাস্ লিখে দিলেন:

'মিঃ ভ. ই. উলিয়ানভকে কারখানা গৃহাদি পরিদর্শন করিবার অন‍ুমতি দেওয়া হইয়াছে।'

ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে কারখানার চত্বরে ঢুকলেন। বিরাট কারখানা, তাতে কর্মশালা বহ‍ু। যন্ত্রপাতি আর শ্রমিকদের দক্ষতা দেখে লেনিনের মনে তার ছাপ পড়েছিল; শ্রমিকদের ম‍ুখগ‍ুলি বড় ক্লান্ত।

ফোরম্যান বললেন:

'আমরা আলোর খাতে খরচ বাঁচাই, তাই ওদের সবাইকে অমন রোগা দেখায়।'

শহরে তখন নেমে এসেছে শীতের সন্ধ্যা। ঠিক সেই সময়ে ভ্লাদিমির ইলিচ ছিলেন ইস্পাত রোলিং কর্মশালায়। ছাদ থেকে লোহার আঁকড়া থেকে ঝুলানো তেলের বাতি দিয়ে সেখানে আলো দেবার ব্যবস্থা। বাস্তবিকই, সে বাতির মিটমিটে আলোয় সবাইকে যেন ধ‍ূসর, রোগীর মতো মনে হয়। আগন্তুককে কোন উঁচু দরের রাজকর্মচারী মনে ক'রে ফোরম্যানটি কাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়া তাঁকে দেখাচ্ছিলেন। এযাবত সবই চলছিল বেশ খাসা — তখন লেনিন ঐ কর্মশালা থেকে বেরোবার ম‍ুখে।

' এ কী হচ্ছে?' পেঁচার মতো গোল চোখ একজন তর‍ুণ শ্রমিকের উদ্দেশে ফোরম্যান বলল কড়া গলায়।

লম্বা বেড়ি দিয়ে একটা ইস্পাতের রেল সামলে কাজ করতে করতে শ্রমিকটি প্রায় গিলে গিলেই খাচ্ছিল প্রকান্ড এক টুকরো বাদামী রঙের র‍ুটি।

'বলি, এ কী হচ্ছে?' আরও কড়া গলায় বলল ফোরম্যান।

'ভুখা কি কাজে মদৎ দেয়?' এই উত্তর দিয়ে শ্রমিকটি ম‍ুচকে হাসল।

'ঐ দাঁত দেখানো বন্ধ করো! কার সঙ্গে কথা বলছ সেটা জানো না কি?'

'নিজের কাজ তো করে যাও,' শ্রমিকটি ভ্র‍ুকুটি করল।

ফোরম্যানও ভ্রূকুটি করল।

'এই অশিষ্টতার জন্যে তোমার জরিমানা হবে,' এই বলে সে চলে গেল।

ভ্লাদিমির ইলিচ চললেন তার পিছন পিছন। গর্তের মতো একটা ছোট্ট আপিস-ঘরে গিয়ে ফোরম্যানটি ডেস্ক থেকে শ্রমিকদের মজুরি তালিকাটা তুলে নিয়ে তাতে জরিমানা লিখল।

'দেখতে পারি একটু?' ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন।

'হুম্!' ইস্পাত রোলিং এবং অন্যান্য কর্মশালায় কাজের সময় তালিকা দেখতে দেখতে তিনি কাশলেন। 'কাজের সময় বার ঘণ্টা, তার মধ্যে কোন বিরতি নেই। শ্রমিকরা লাঞ্চ খাবার জন্যে বাড়ি যাবার সময় পাবে না।'

ভ্লাদিমির ইলিচ অবাক হয়ে বললেন:

'না খেলে কাজ করবে কেমন করে?'

'লাঞ্চ ওরা সঙ্গে নিয়ে আসে।'

'কিন্তু আপনি খাবার জন্যেই শ্রমিকটিকে তিরস্কার করলেন।'

'অভদ্রতা দেখাল — কী গোস্তাকি,' বিড়বিড় করে কথাটা বলতে বলতেই ফোরম্যান বুঝতে পারল যে, আগন্তুকটি জরিমানার বিরুদ্ধে। এটা তার কাছে অদ্ভুত লাগল!

ঘং, ঘং! — কর্মশালায় একখানা লোহার রেল দিয়ে ঘণ্টার কাজ চলে — সেটায় কেউ ঘা মারছিল। সেই আওয়াজ শুনে বাইরে কারখানার বাঁশিও বেজে উঠল। দিনের শিফ্‌ট্ শেষ হল।

'হেই, ফিওদর!' যে শ্রমিকটিকে তিরস্কার করেছিল তাকে ডেকে ফোরম্যান বলল, 'আমি তোমার জরিমানা নাকচ করে দিয়েছি। এই অতিথিকে সেজন্যে ধন্যবাদ জানাতে পারো।'

শ্রমিকটি ওঁদের দিকে এক নজর তাকালও না, কিছু বললও না।

'ঐ হল তার ধন্যবাদ জানাবার বহর! আর আপনি বলছেন কিনা এদের প্রতি সদয় হতে!' ফোরম্যান রেগে বলল কথাটা।

ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন:

'ক্লান্ত, ভুখা মানুষ সব সময়ে ভব্য শিষ্ট নাও হতে পারে।'

শত শত শ্রমিকের ভিড়ে মিশে তিনি কারখানা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। এক ঘণ্টা পরে অগরোদ্‌নি লেন-এ পুতিলভ কারখানার শ্রমিকদের পাঠচক্র বসবে। সেখানে ভ্লাদিমির ইলিচের আসবার কথা। শ্রমিকরা তাঁকে ফিওদর পেত্রোভিচ নামে চেনে।

সন্ধ্যার দিকে আরও ঠাণ্ডা পড়ল। ঠাণ্ডা হাওয়ার তীক্ষ্ম ঝাপ্টা লাগছিল মুখে। ভ্লাদিমির ইলিচ ওভারকোটের কলার তুলে দিলেন।

'কী জীবন!' তিনি ভাবছিলেন, 'দিনে বার ঘণ্টা খাটুনি, লাঞ্চের ছুটি নেই, জরিমানা আছে পদে পদে!'

লেনিন অগরোদ্‌নি লেন-এ সেই বাড়িটায় পেঁছিলে তাঁর চেনা একজন শ্রমিক এসে তাঁকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। পাশের কামরার খোলা দরজা দিয়ে তিনি শুনলেন কে যেন বিদ্রুপাত্মক অনুকরণ করে বলছে:

'এই অতিথিকে ধন্যবাদ জানাতে পারো! কিন্তু, অতিথি তো চলে গেছেন নিজের রাস্তা ধরে, এদিকে আমার জরিমানা হবে আবার কালও।'

'আজকের ঘটনা নিয়ে তারা আলোচনা করছে,' ভাবলেন লেনিন।

সেই কামরায় চটপট ঢুকেই ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন:

'খুব সম্ভব তা হবে। হয়ত তা হবে এবং সেটা হবে কোন সঙ্গত কারণ ছাড়াই!'

সেদিন যে ফিওদর নামে তরুণ শ্রমিকটিকে তিনি দেখেছিলেন তার কথা শুনছিল টেবিল ঘিরে বসে জনা পনর শ্রমিক।

'আমি ফিওদর পেত্রভিচ — আমরা এক নাম!' এই বলে ভ্লাদিমির ইলিচ মুচকি হাসলেন।

ফিওদর বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল:

'আরে, ইনিই তো আজ এসেছিলেন কর্মশালায়!'

সবাই চুপচাপ। কাউকে কাউকে খুবই মনমরা দেখাচ্ছিল। লেনিন তাতে বিচলিত হলেন না — তিনি বরং খুশিই হলেন।

'আপনারা বেশ সাবধানী, এটা লক্ষ্য করে আমি খুশি হয়েছি!' তাড়াতাড়ি বললেন ভ্লাদিমির ইলিচ, 'আর হ্যাঁ, কমরেড ফিওদর, অবস্থাটাকে আপনি খুব ঠিকই ধরেছেন। ঠিকই, 'অতিথি তো চলে গেছেন নিজের রাস্তা ধরে', কিন্তু রইল ফোরম্যান, রইল ম্যানেজার — তারা জরিমানা করে করে আপনাদের গলা টিপে ধরতেই থাকবে।'

এটা তাদের জীবনের, তাদের ভবিষ্যতের ব্যাপার—তাই, শ্রমিকরা নিবিড় মনোযোগ দিয়ে শুনছিল তাঁর কথা। ফিওদর বসে পড়ল শান্তভাবে।

'এর বিরুদ্ধে লড়বার উপায়টা কী?' ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন, 'এক জোট হওয়াই একমাত্র উপায়।'

শুনে ফিওদর ভাবছিল:

'হক কথা! পুঁজিপতিদের সঙ্গে তো একলা মোকাবিলা করা যায় না। আমাদের জোট বাঁধা দরকার।' এখন সে যেন বুকে আরও বেশি বল পাচ্ছিল, তার সাহস যেন বেড়েই যাচ্ছিল। জারের শাসনের বিরুদ্ধে, কারখানা মালিকের বিরুদ্ধে লড়বার কর্মসূচি নিয়ে শ্রমিকদের আলোচনা চলল অনেক রাত অবধি — এই আলোচনায় ভ্লাদিমির ইলিচের কথা থেকে তারা শিখল অনেকিছু।

পাঠচক্র শেষ হলে ফিওদর বলল:

'চলুন, আপনাকে বাড়ি পেঁছে দিয়ে আসব!'

তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল — এই সন্ধ্যাটা তার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে গেল।

কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন:

'আমি দুঃখিত, তা হয় না। আমরা দুজনেই বিপ্লবী। ধরুন, আমাদের পিছু নিয়ে ধরবার জন্যে বাইরে যদি কোন পুলিসের চর থাকে — তাহলে? তাহলে আমরা দুজনেই ধরা পড়ে যাব। কাজেই, দেখতেই পাচ্ছেন, আমাদের আলাদা আলাদাই যাওয়া উচিত। সাবধানতা আর গোপনতার কথা সব সময়ে মনে রাখবেন। সাবধানতা আর গোপনতা মানে কী জানেন? গুপ্ত বিষয়। কোন পুলিসের চর, কোন ফোরম্যান, কোন ম্যানেজার যেন আমাদের মেলামেশার কথা জানতে না পারে! বুঝলেন তো?'

এই বলে তিনি আঙুল নেড়ে হুঁশিয়ারি জানালেন — সেটা আপাতদৃষ্টিতে কৌতুক হলেও যথার্থই।

প্রথমে একজন শ্রমিক চলে গেল, তারপরে আর একজন, তারপরে আরও একজন — তখন এল ভ্লাদিমির ইলিচের পালা। গোপনতার জন্য তাঁকে নাম নিতে হয়েছিল ফিওদর পেত্রভিচ।

বাইরে বেরিয়ে সেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় তিনি খুশির আমেজে শ্বাস গ্রহণ করলেন। তিনি তখন খুশি — কেননা, জরিমানার ব্যবস্থা সম্বন্ধে, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়াই সম্বন্ধে আরও বেশি জানবার জন্যে শ্রমিকরা খুবই আগ্রহশীল ছিল। তিনি এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখতে মনস্থ করলেন।

যেতে যেতে তিনি ভাবতে থাকলেন সেই প্রবন্ধটা সম্বন্ধে, কিন্তু হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন... সেটা ছিল চাঁদনি রাত। আকাশে শাদা শাদা মেঘের ছুটাছুটি, তার ফাঁকে ফাঁকে হলদে চাঁদের গা-ভাসানো যাওয়া আসা; রাতের জনমানবশূন্য রাস্তায় রাস্তায় গাছপালা আর বেঞ্চিগুলো সেই চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত। হঠাৎ ভ্লাদিমির ইলিচ দেখতে পেলেন রাস্তার ওধারে আলো ছায়ার ভিতর দিয়ে হনহনিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে চলেছে একটা লোক। যেন পুলিসের লোকটাকে দেখতেই পান নি, এমনি ভাব করে লেনিন চলতে থাকলেন শান্তভাবেই, কিন্তু হাঁটতে থাকলেন আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি। পিটারগফ্ স্ট্রীটে ঘোড়ায় টানা ট্র্যামের ঘণ্টির আওয়াজ শুনে তিনি পা চালিয়ে গিয়ে কোনমতে ধরলেন গাড়িটা, কিন্তু পুলিসের লোকটাও সেই গাড়িতে চড়তে পারল। ভ্লাদিমির ইলিচ লোকটাকে দেখে নিলেন চটপট: লোকটার মোচ কালো, চোখে কালো চশমা। সামনের দরজার কাছে একটা আসনে বসে, ওভারকোটের কলারটা তুলে দিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ ভাবতে থাকলেন কী করে এই ফেউটাকে খসানো যায়।

তাঁর নামবার জায়গা তখনও অনেক দূর... তিনি ঘুমিয়ে পড়বার ভান করলেন। মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে গাড়ির সঙ্গে দুলতে দুলতে তিনি পালাবার উপায় ভেবে নিচ্ছিলেন। জানালাগুলো বরফে ঢেকে গেছে — গাড়ি কোথায় এল বুঝবার উপায় নেই। পুলিসের লোকটা দু' সারি পিছনে।

'আমার নিজের স্টপের তিন স্টপ আগে নেমে পড়ব। কিন্তু সে স্টপটা ঠিক কোথায় সেটা তো বোঝা দরকার।' ঘুমের ভান করে ভ্লাদিমির ইলিচ জানালায় ভর করলেন। কিন্তু আসলে তিনি সেই জমাট বাঁধা কাচের উপর নিশ্বাস ছাড়ছিলেন। কোন্ স্টপ এল সেটা হেঁকে বলবার জন্যে তিনি কণ্ডাক্টরকে বলতে পারতেন, কিন্তু পুলিসের লোকটা তাঁর 'র' উচ্চারণ শুনে চিনে ফেলুক সেটা তিনি চান না — সেটা খুবই বিপজ্জনক।

কাচের উপর নিশ্বাস ফেলে ফেলে ভ্লাদিমির ইলিচ সেখানে ছোট্ট এক টুকরোয় বরফ গলিয়ে দিতে পারলেন। গাড়ি কোথায় পেঁছিল সেটা চোখ কুঁচকে একবার তিনি দেখে নিলেন। আর মাত্র এক স্টপ বাকি... এই, এসে গেছে। গাড়িখানা দাঁড়িয়ে গেল।

'নামবার আছে কেউ?' কণ্ডাক্টর ডাক ছাড়ল।

কেউ সাড়া দিল না। ভ্লাদিমির ইলিচও কিছু বললেন না, কিন্তু তাঁর বুক ঢিপঢিপ করছিল। গাড়িখানাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘোড়াগুলো আবার চলতে শুরু করতেই ভ্লাদিমির ইলিচ চটপট

উঠে পড়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লেন। ছুটে গেলেন একটা উঠোনের মধ্যে — সেই উঠোনটা থেকে আর একটা রাস্তায় বেরোন যায়। এটা পালাবার পক্ষে খাসা সেটা তাঁর জানা ছিল। ছুটতে ছুটতে গাড়ির ঘণ্টির আওয়াজ আর অনেক লোকের চিৎকার তাঁর কানে এল। ফটকের ভিতরে ঢুকে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে তিনি পিছনে তাকালেন। গাড়িখানা তখন থেমে গেছে, পুলিসের লোকটা নেমে রাস্তায় এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছিল। রাস্তা ছিল জনমানবশূন্য। কোথাও কোন বাড়িতে একটাও আলো নেই। ততক্ষণে গাড়িখানা আবার ছেড়ে চলে গেল।

ভ্লাদিমির ইলিচ সেই উঠোনটা পার হয়ে তার পরের রাস্তায় পড়ে বাড়ির দিকে চললেন।
 তাঁর বাড়িওয়ালী ঘুমুচ্ছিলেন। গুড়িগুড়ি রান্নাঘরে ঢুকে তিনি একটু চা তৈরি করে নিয়ে একটুকরো রুটি নিলেন — খিদে পেয়েছিল খুবই।

একটুকরো রুটি চিবোতে চিবোতে আর গরম চায়ে আস্তে আস্তে চুমুক দিতে দিতে ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন আপন মনে:

'তাহলে কমরেড সব, কী কথা হচ্ছিল?'

'আপাতত এতেই পুলিসের লোকটাকে এড়ানো যাবে,' মনে মনে এই বলে তিনি আপন মনে হাসলেন। 'তাহলে, আমাদের কথা হচ্ছিল এই যে...'

ভ্লাদিমির ইলিচ তাকালেন জানালার দিকে। সুন্দর সুন্দর বরফের ফুল আর লতাপাতায় জানালার কাচ ছেয়ে গেছে।

বরফের নীল আর শাদা ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তিনি ভাবছিলেন:

'আমাদের অন্য কেউ এসে মুক্ত করে দেবে না—নিজেদের মুক্তির জন্যে লড়তে হবে আমাদের নিজেদেরই।'

জ. ভস্ক্রেসেনস্কায়া

বন্ধুত্বের অঙ্কুরি

মে মাস। শুশেনস্কোয়ে* গ্রামের চারদিককার কালো মাঠগুলো ছোট ছোট সবুজ ঘাসে ঢেকে গেছে। অনিবিড় বনভূমির নতুন সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। রাস্তার কাদা শুকিয়ে গেছে।

অস্কার বাড়ির বাইরে বসে বৃদ্ধা বাড়িওয়ালীর বোনার কাঁটা দুটোর দিকে তাকিয়ে ছিল। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন:

'তোমার শরীর খারাপ লাগছে, বাছা?'

অস্কার কোন উত্তর দিল না। কী বলবে? কী যে হয়েছে সেটা সে নিজেই জানে না। কষ্টটা কি এবং ঠিক কী রকমের কষ্ট, সেটা বুঝবার জন্যে ভ্লাদিমির ইলিচ এক ঘণ্টা ধরে তাকে নানা প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু অস্কার তাঁকে সেটা বলতে পারে নি। তার দুর্বল লাগে — শুধু এই। তার যেন সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে — এই মাত্র বাইশ বছর বয়সেই! তার উপর তার বাহু দুটো সব সময়ে প্রতিবন্ধক। শুলে পরে গায়ের নিচে বাহুটাকে মনে হয় একখানা কাঠের মতো। হাঁটবার সময়ে বাহু দুটো কেমন যেন ঝুলতে থাকে। বসলে, হাত দু'খানা নিয়ে যে কী করবে তা ভেবেই পায় না।

অস্কার বলেছিল:

'লোকের বাহু দুটো সত্যিই অসুবিধাজনক।'

কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিচ সেটা শুনে একটু হেসে বলেছিলেন:

'তুমি আবার ভাল হয়ে উঠবে — তার ব্যবস্থা আমরা করব। তাতে কোন বাধা নেই।'

ভ্লাদিমির ইলিচ ছিলেন অসাধারণ মানুষ। সব সময়েই তাঁর মেজাজ ভাল থাকত; নির্বাসনে যেন তাঁর কিছুই এসে যায় না। তিনি কাজ করতেন বিস্তর, লিখতেন বিস্তর, তার উপরও সময় করে শিকারে যেতেন, আর অসম্ভব সব দাবার সমস্যার মীমাংসা করতেন। সন্ধ্যায় তিনি অস্কারকে রাজনীতিক বই পড়ে শোনাতেন।

প্রতিবেশীর ছেলে লিওঙ্কা ছুটে যাচ্ছিল — তার কাঁধ থেকে ঝুলছিল ক্যাম্বিসের ইস্কুলের ব্যাগ। তার খালি পায়ের ঘায়ে ধুলো উঠছিল।

অস্কারের বাবা ফিনল্যান্ডের একজন শ্রমিক যখন অস্কারকে শিক্ষানবীশ করবার জন্যে বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলেন তখন সে ছিল এই লিওঙ্কার চেয়ে সামান্য বড়। পিটার্সবুর্গে নেভ্স্কি

---

* শুশেনস্কোয়ে — সাইবেরিয়ার একটা গ্রাম — সেখানে ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ সাল অবধি ভ. ই. লেনিন নির্বাসনে ছিলেন।

প্রসপেক্টে একটা দোকানের বড় জানালার সামনে তারা দাঁড়িয়ে দেখছিল। কাচের পিছনে বেগুনে রঙের মখমলের উপর বিছানো ছিল এক রাজার মণিমুক্তা: তার মধ্যে ছিল নানা লকেট-লাগানো সব সোনার চেন, ভারী ভারী ব্রেস্‌লেট, দামী দামী পাথরের ছোট্ট ছোট্ট তোড়া দিয়ে তৈরি সব ব্রোচ্ আর নানা রকম আংটি। পাথরগুলো দেখতে কোন কোনটা মধুবিন্দুর মতো, কোন কোনটা যেন শিশিরবিন্দু। তার বাবা বলেছিলেন, 'একদিন অমনি সব জিনিস তুই নিজেই তৈরি করবি। তুই সেকরার শিক্ষানবীশ হবি।' ও তখন আনন্দের উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে তখন যেন দেখতেই পাচ্ছিল যে, মখমলের টুপি মাথায় পরে, মখমলের টুলে বসে নানা সূক্ষ্ম হাতিয়ার দিয়ে ঐসব সুন্দর জিনিস গড়ছে।

প্রথম যে হাতিয়ারটিকে অস্কার সরাসরি জেনেছিল সেটা ছিল একটা রিগেল্ — সেটা একটা ইস্পাতের দণ্ড, তার উপর আংটির আকৃতি ঠিক করা হয়। সেকরা তাইফের কতবার যে ঐ ডাণ্ডা দিয়ে তাকে মাথায় পিটিয়েছে সেটা আর মনে নেই। অস্কারকে কখনও তার নাম ধরে ডাকা হত না — বলা হত: 'এই, ফিন্!'

সেখানে কাজের চার বছরে অস্কার তার মনিবের বাচ্চাদের রাখত, সে ছিল রুটি আর ভদকা আনবার খানসামা, আর এইসব কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকে সেকরার কাজের অতি প্রাথমিক কিছু কিছু শেখানো হত। ষোল বছর বয়সে সে ঐ মনিবের বাড়ি ছেড়ে গিয়ে পুতিলভ কারখানায় কাজ নিয়েছিল।

সেই সেকরার শিক্ষানবীশ হল পুতিলভ কারখানায় একজন লেদ্‌চালক। হাড় জিরজিরে ছেলেটা সবার ফাইফরমাশ খাটত — সে হয়ে উঠল একজন তাগড়া শ্রমিক আর সাহসী বিপ্লবী। পুলিসের একটা গুপ্তচরকে শ্রমিকেরা ধরে ফেলেছিল — সেই চরটা টের পেয়েছিল অস্কারের গায়ে কত জোর। চরটাকে পিটুনি দিয়েছিল বলে অস্কারকে তিন বছরের নির্বাসনে পাঠাল সাইবেরিয়ায়।

...অস্কার বেঞ্চি থেকে উঠে ভিতরে গেল। মাথার নিচে দু' হাত রেখে সে শুয়ে থাকল। সে হয় ঘুমিয়ে পড়ছিল, নইলে একটা কিছু ভাবছিল।

বাইরে গাড়ির চাকার ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ আর বাচ্চাদের গোলমাল শুনে সে উঠে বসল। জানালার কাছে গিয়ে সে দেখল রাস্তার ওপারে জীরিয়ানভদের বাড়ির সামনে একখানা ছ্যাকরা গাড়ি থামল। গাড়িতে দুজন মহিলা — তাঁদের পরনে শহুরে পোশাক। গাড়িখানা ঘিরে যে বাচ্চারা ভিড় করেছে তাদের মধ্যে লিওঙ্কা।

'আরে, এঁর সঙ্গে তো ভ্লাদিমির ইলিচের বিয়ে হবে!'

অস্কার বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে রাস্তা পার হল।

'আপনি নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনা — তাই না? আপনারা সব ভালো আছেন তো?' এই বলে সে ধূসর পোশাক পরা তন্বী তরুণীটিকে অভিবাদন জানাল।

মেয়েটির চোখের রঙ ফিকে ধূসর। তিনি অস্কারের দিকে বলিষ্ঠ দৃষ্টিতে তাকালেন — তাঁর মুখে মৃদু হাসি।

'আর, আপনি নিশ্চয়ই সেই অসুস্থ অস্কার? কিন্তু আপনাকে তো মোটেই অসুস্থ দেখায়

না! আপনি কেমন আছেন?' তিনি করমর্দনের জন্যে অস্কারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'আসুন, আমার মা ইয়েলিজাভেতা ভাসিলিয়েভনার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিচকে দেখছি নে কেন? তাঁর অসুখবিসুখ করে নি তো?'

পা দিয়ে ধুলো সরাতে সরাতে লিওঙ্কা জানাল:

'তিনি শিকারে গেছেন।'

অন্যান্য ছেলেরাও তাই বলল।

খবরটা শুনে একটু আশা ভঙ্গ হয় — তাই সেটাকে একটু মোলায়েম করবার জন্যে অস্কার বলল:

'ভ্লাদিমির ইলিচ রোজ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তো চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। শেষে কিনা আজই গেলেন শিকারে!'

'তাহলে কী করা যায়?' মুশকিলে পড়বার ভান করে নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনা বললেন, 'তাহলে আমরা কি ফিরে যাব?'

'না, না!' লিওঙ্কা বাধা দিয়ে বলল, 'তিনি সন্ধের আগেই ফিরে আসবেন।'

অস্কার ওঁদের জিনিসপত্র বাড়ির মধ্যে নিচ্ছিল। বাচ্চারা তাকে সাহায্য করল। তারপরে অস্কার নিজের কামরায় ফিরে গেল।

সন্ধ্যায় লিওঙ্কা এসে অস্কারের জানালায় টোকা দিল। সে বলল ভ্লাদিমির ইলিচ তাকে ডাকছেন। অস্কার ফিটফাট হয়ে জামা কাপড় পরল।

জীরিয়ানভদের বাড়িতে হাসিখুশির হাঁক-ডাক। ভ্লাদিমির ইলিচের চোখে মুখে খুশি ফুটে উঠছিল। পেয়ালা আর পিরিচগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে তিনি নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনাকে সাহায্য করছিলেন, আর উপহারগুলো বের করবার জন্যে খোশামোদ করছিলেন। নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনা কি কি বই এনেছেন সেটা দেখবার জন্যেই তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি।

মাথা নেড়ে নেড়ে নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনা বলছেন, 'না, না!' তিনি রাগের ভাব দেখাতে চাইছিলেন, কিন্তু তাঁর চোখে ছিল হাসি। 'আমরা এসে তো তোমার দেখাই পেলাম না — তোমাকে উপহার দেওয়া হবে না। উপহার পাবে শুধু লিওঙ্কা আর অস্কার আলেক্সান্দ্রভিচ — তারা ছিল আমাদের আসার সময়ে।' তিনি লিওঙ্কাকে দিলেন চকচকে ঝকঝকে ছবিতে ভরা একখানা আনকোরা নতুন বই। আর একটা ঝুড়ি দেখিয়ে তিনি অস্কারকে বললেন, 'এখানে আপনার জন্যে কিছু ওষুধ আছে।'

ভ্লাদিমির ইলিচ সায় দিয়ে বললেন:

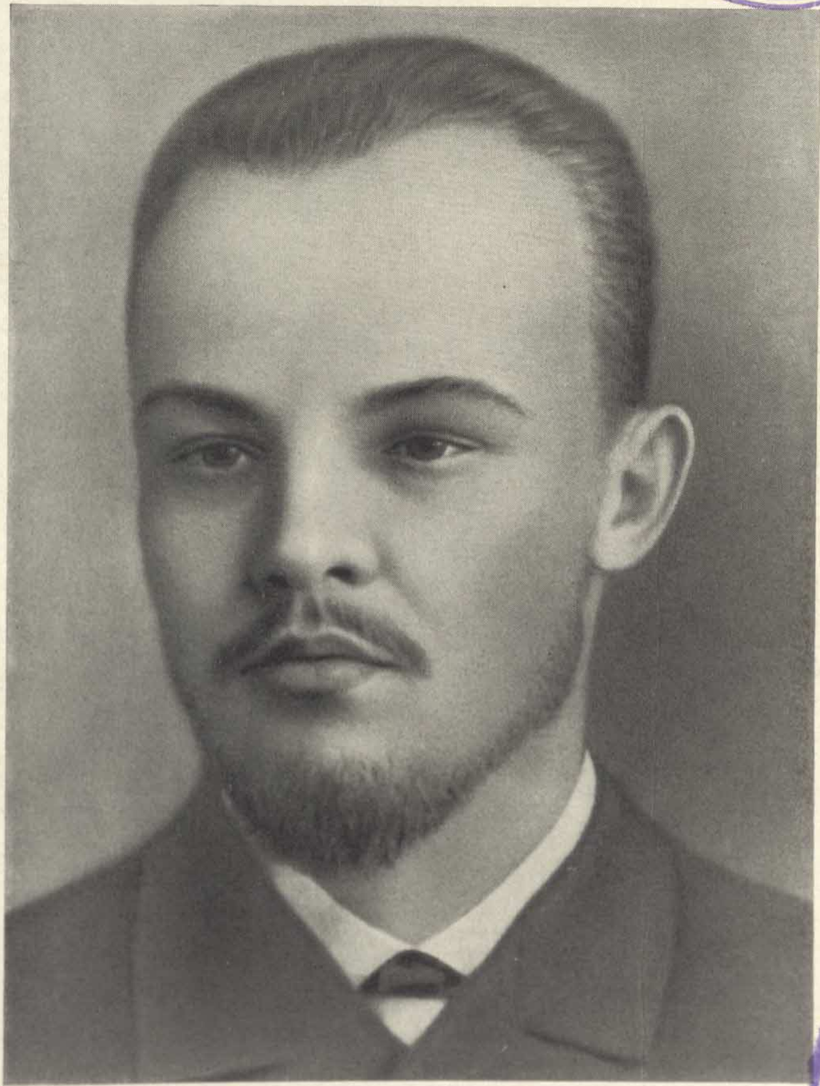
'ঠিক, বড়িটা সত্যিই কড়া ওষুধ।'

অস্কার ইতস্তত করে ঝুড়িটার কাছে গিয়ে নিচু হয়ে তার বাঁধন খুলতে লাগল। ঢাকনাটা খুলে সে দেখল তেলা নীল কাগজে জড়ানো অনেকগুলো ছোট মোড়কে ঝুড়িটা ভরতি। একটা মোড়ক খুলে যা দেখল তাতে অস্কারের নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। সেখানে ছোট্ট একটা সেকরার নেয়াই। তারপরে মোড়ক খুলল আর একটা, আরও একটা, আরও একটা। পুরো এক প্রস্থ সেকরার হাতিয়ার। আর সবার নিচে একটা রিগেল্।

শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে — সামনে সব
লড়াইয়ের জন্যে তাদের প্রস্তুত হওয়া চাই

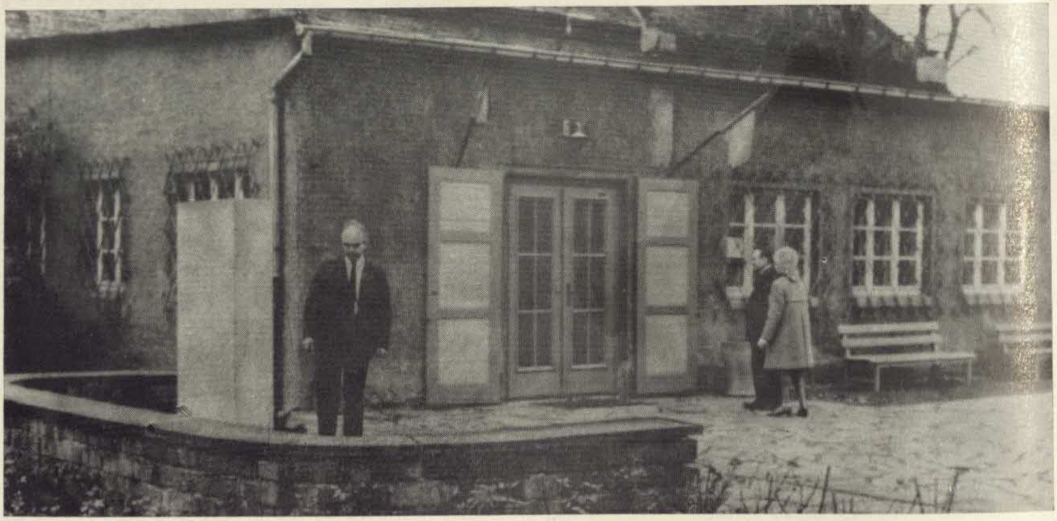


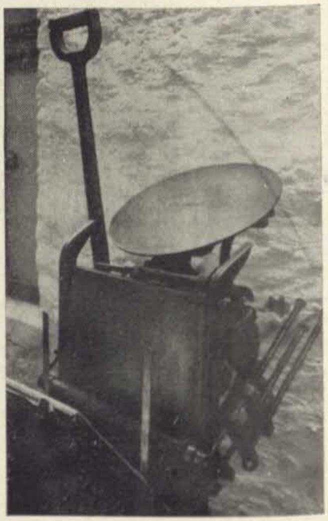
২১ বছর বয়সে ভ্লাদিমির — বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র



লাইপজিগে যে বাড়িতে মার্কসবাদী 'ইস্ক্রা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ছাপার কাজ লেনিন তদারক করেছিলেন

এই ছোট মুদ্রণযন্ত্রে ছাপা হত সব বৈপ্লবিক প্রবন্ধ





নাদেজদা ক্রুপ্‌স্কায়া, যিনি পরে হয়েছিলেন লেনিনের স্ত্রী, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কাজের সাথী



'সেই রিগেল্ — যার উপর তোমার অত রাগ!' ভ্লাদিমির ইলিচ বলে উঠলেন। 'দাও তো, জিনিসটা একটু দেখি।'

অস্কার আপত্তি জানিয়ে বলল:

'জিনিসটার উপর রাগ হয় — যদি ওটা দিয়ে কেউ মারে।' খুব অপ্রস্তুত বোধ করে সে উঠে দাঁড়াল।

ক্ষীণজীবী দুই নারী এই ভারী ঝুড়িটা বয়ে নিয়ে এসেছেন সাড়ে চার হাজার মাইল দূর থেকে। অস্কার ভাবছিল, ঐ ঝুড়ি নিয়ে তাঁদের কত বার ট্রেন বদল করতে হয়েছে, ঘোড়ার গাড়ি বদল করতে হয়েছে, অনেকবার হয়ত ওঁদের সাহায্য করবার লোকও ছিল না — তখন ওটাকে বইতে হয়েছে ওঁদের নিজেদেরই।

'এ আপনার দোষ,' অভিযোগের সুরে সে বলল ভ্লাদিমির ইলিচকে, 'আমি তো ওগুলো আনতে বলি নি — না, বলি নি তো। আমি শুধু এর স্বপ্ন দেখেছি।'

ছোট গ্রাম শুশেনস্কোয়েতে লেদচালকের জন্যে কোন কাজ ছিল না, কিন্তু স্থানীয় পয়সাওয়ালা লোকেরা সেকরার কাজের জন্যে ফরমাইশ দেবে অনেক। কথাটা অস্কার একবার ভ্লাদিমির ইলিচকে বলেছিল। অস্কারের সেটা আর মনে ছিল না, কিন্তু লেনিন ভোলেন নি।

খুশি গলায় ইয়েলিজাভেতা ভাসিলিয়েভনা বললেন:

'আপনার অসুখ সম্বন্ধে ভ্লাদিমির ইলিচ আমাদের যা চিঠি লিখেছিলেন তাতে আমরা তো ভাবছিলাম আপনার জন্যে একটা লেদই নিয়ে আসব।' এ কথা বলতেই ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর দিকে কটমট করে তাকিয়ে ঠোঁটে আঙুল তুললেন।

পরদিন সকালে অস্কার নিজের কামরাটা পরিষ্কার করল — সে এত ভালভাবে পরিষ্কার করে নি আর কখনও। সে ঘষে ঘষে মেঝে সাফ করল, আঁচড়ে আঁচড়ে কাঠের টেবিলখানা পরিষ্কার করল। তার উপর একখানা পরিষ্কার ক্যাম্বিসের চাদর বিছিয়ে তার বড় আদরের জিনিসগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে রাখল।

অস্কার কি করবে ঠিক করে ফেলল।

পকেট থেকে একটা পাঁচ কোপেক মুদ্রা বের করে সে দুই মাথাওয়ালা ঈগলটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিল। সেটা হল রুশ সাম্রাজ্যের প্রতীক চিহ্ন; পুলিসের টুপির ফিতেয়ও ঐ একই প্রতীক থাকে। ঈগলটা নখরে আঁকড়ে ধরে আছে একটা রাজদণ্ড। সেটা দেখে সেকরা তাইফেরের তোলা হাতে রিগেল্-এর কথা অস্কারের মনে পড়ে গেল।

মুদ্রাটাকে নেয়াইয়ের উপর রেখে সে হাতুড়ি দিয়ে হিংস্রভাবে সেটাকে পিটতে থাকল। সেটা বেঢপ হয়ে গেল। পেটাতে পেটাতে সেটা একটা লাল তামার চাকতি হয়ে গেলে সে ফুৎদীপটা (ব্লো-ল্যাম্প) জ্বালল। ধাতুটাকে তখন দেখাচ্ছিল যেন পারদ ঝিকিমিকি করছে। অস্কার সেটাকে ছাঁচে ঢেলে এক বালতি জলে চুবিয়ে নিল। সে কাজে তন্ময় হয়ে গেল। উখা দিয়ে ঘষে আংটিটাকে পালিশ করল, তারপরে রিগেল্ দিয়ে সুগোল করে নিল। তখন সেই ছোট্ট তামার আংটিটা চকচক করছিল যেন সোনার মতো। দুপুরবেলায় বাড়িওয়ালী এসে বললেন খাবার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অস্কার হাত নেড়ে তাঁকে চলে যেতে বলল। তার আর খাবার সময় নেই। সে কাজে বড়

ব্যস্ত। অস্কার নিজের হাত দু'খানার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। শিরাগুলো সামান্য ফুলে ফুলে উঠেছে, কিন্তু বেশ হাল্কা লাগছে, হাত দু'খানা আবার বেঁচে উঠেছে; বাহু দুটোকে আর প্রতিবন্ধক মনে হচ্ছে না। কয়েক বার আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে সে আঙুলগুলোর ভিতরে রক্তের গতি অনুভব করল।

কাজ করতে করতে সে গুন্‌গুন্‌ করে গাইছিল ফিনল্যান্ডের একটা গান। সন্ধ্যার দিকে আর একটা আংটি তৈরি হয়ে গেল। তারপরে একটুকরো কাগজের উপরে একটা জটিল নকশা এঁকে সেটাকে একটা দেশলাইয়ের বাক্সে সেঁটে দিল।

পরদিন সকালে শিশির উবে যাবার আগেই সে ছুটে গেল শুশা নদীর পাড়ে। তখন মে মাস, ভুঁইপদ্ম আর ড্যান্ডিলিওন ফুটেছে বিস্তর। অস্কার একটা তোড়া তৈরি করে ফেলল। সে একটা আংটি বের করল। আংটিটা রোদে হীরের মতো চকচক করতে থাকল। আর কখনও কোন আংটি তার এত ভাল লাগে নি।

অস্কার জীরিয়ানভদের বাড়ির দিকে চলল আস্তে আস্তে। কিন্তু তখনই অধৈর্য হয়ে উঠে সে টুপি খুলে ছুটতে আরম্ভ করল। ভ্লাদিমির ইলিচ আর নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনাকে এই উপহার দিতে হবে — তার আর দেরি সয় না।

নদীর স্বচ্ছ জল, সুগন্ধী বনভূমি, আর পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আনন্দ, ভাল বন্ধু পাবার আনন্দ নিয়ে অস্কার একটা গান বেঁধেছিল — সেই গানের কথাগুলি ভেসে ভেসে চলল সাইবেরিয়ার হাওয়ায়-হাওয়ায়।

*

সেই আংটি দুটি এখন মস্কোয় লেনিন মিউজিয়মে আছে। এতকাল পরে আংটি দুটো কালো হয়ে গেলেও এখনও সুন্দর — তার কারণ, সে আংটি তৈরি হয়েছিল ভালবাসা দিয়ে, আর কাজ করতে উৎসুক হাত দিয়ে তা গড়া হয়েছিল। সেটা সত্যিই ছিল ভালবাসার দান। আংটি দুটি সত্যিই বন্ধুত্বের অঙ্গুরি।

জ. ভস্ক্রেসেনস্কায়া

স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখা

৫৬

তিন দিন ধরে একটানা বৃষ্টি হচ্ছিল। ফুলের কেয়ারিগুলোয় ফুলগুলিকে দেখাচ্ছিল যেন কাদার উপর দিয়ে টেনে নেওয়া হয়েছে। হাওয়ার দাপটে ঝরে-পড়া কাঁচা আপেলে ছোট খানা-খাতগুলো ভরতি। পাখি ডাকে না। বৃষ্টির জলে ফুলে উঠে নদী এসে গেছে বেড়ার কোলে।

ছোট কাঠের বাড়িটায় দুরন্ত আবহাওয়া আর উদ্বেগের ছাপ রয়ে গেছে। অল্প কয়েক সপ্তাহ আগেও জুলাইয়ের গরম দিনগুলোয় বাড়িটা রোদে আর খুশিতে ভরা ছিল। ভ্লাদিমির ইলিচ আসবেন — তারই জন্যে উলিয়ানভ পরিবার অপেক্ষা করে ছিল।

...দশ দিন আগে তাঁর মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন কষ্টের দিনগুলো শেষ হয়ে গেছে, তাঁর ছেলেমেয়েরা মুক্ত। ভ্লাদিমির ইলিচ তখন সাইবেরিয়ায় তিন বছরের নির্বাসন থেকে সবে ফিরেছেন। দেশের কোন শিল্পকেন্দ্রে তাঁর থাকা পুলিস থেকে মানা করে দিয়েছে। তাই তিনি থাকছেন প্স্কভে। যতটা সম্ভব বিপ্লবী পিটার্সবুর্গের কাছাকাছি থাকবার জন্যে এই জায়গাটা। রাশিয়ার সর্বত্র শ্রমিকদের পাঠচক্র এবং বিভিন্ন বিপ্লবীদের সঙ্গে এই প্রাচীন রুশ শহর প্স্কভ থেকে যোগাযোগ চলতে থাকল। পার্টির একটা সারা রুশ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে লেনিন জমিন তৈরি করছিলেন।

জুন মাসের গোড়ায় তিনি বাড়িতে জানিয়েছিলেন যে, তিনি পদল্স্কে তাঁদের কাছে যাবেন। কিন্তু বাড়িতে খবর গেল যে, ভ্লাদিমির ইলিচ পিটার্সবুর্গে আবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। তখন এক সপ্তাহের বেশি হল তিনি জেলে।

তাঁর মা এ আঘাত সইতে পারলেন না। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা শয্যাশায়ী হলেন। বিষণ্ণ আর নিরানন্দ ছোট্ট বাড়িটায় তাই অত উদ্বেগ। বাড়িতে পোষা কুকুর ফ্রিদ্‌কাও যেন বুঝতে পারল যে, খারাপ কিছু ঘটেছে। সে তার প্রভুর পায়ের কাছে শুয়ে দ্‌মিত্রি ইলিচের দিকে চেয়ে থাকে — তার কান খাড়া, সতর্ক।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে দেখতে ডাক্তার এলেন। আন্না, মারিয়া আর দ্‌মিত্রি তখন খাবার ঘরে। ডাক্তার কখন মায়ের কামরা থেকে বেরবেন সে জন্যে তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন, আর ভ্লাদিমির ইলিচকে কী করে জেল থেকে খালাস করা যায় তাই নিয়ে তাঁরা কথা বলছিলেন। দ্‌মিত্রি একখানা ডাক্তারী বইয়ের পাতা উল্টে দেখছিলেন মায়ের অসুখ সম্বন্ধে যদি কিছু পাওয়া যায়। দাদা গ্রেপ্তার হওয়ায় তাঁরা সবাই ভীষণ ঘা খেয়েছেন। দাদা জেলে — তার মানে হল এই যে, বৈপ্লবিক সংবাদপত্রের জন্যে তাঁদের যে পরিকল্পনা ছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু পরিবার থেকে ভ্লাদিমির ইলিচকে এখন আর সাহায্য করা সম্ভব নয় — কেননা, মারিয়া এবং দ্‌মিত্রি

দুজনেই হালে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, আর আন্না আর তাঁর স্বামী মার্ক্-এর উপরও পুলিস কড়া নজর রাখে।

জানালায় বৃষ্টির ঝাপটা লাগছে, শার্সি বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে মুক্তার ধারার মতো, কাচে আছড়ে আছড়ে পড়ছে গাছের ভেজা পাতা, বারান্দায় একটা মুরগী ডাকল — সে তার বাচ্চাগুলোকে বুঝিয়ে নিজের উষ্ণ ডানার নিচে রাখতে চাইছে বাদলা বৃষ্টি থামা অবধি।

ডাঃ লেভিৎস্কি এলেন খাবার ঘরে। ওঁরা তিন জন উঠে দাঁড়ালেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে আন্না জিজ্ঞাসা করলেন:

'কী হয়েছে? চিকিৎসা কি করতে হবে?' ৫৭

'উদ্বিগ্ন হবার মতো কিছু নয়। সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা হল — খোলা হাওয়া, অনেক সময় ধরে বেড়ানো, আর শুধু সুসংবাদ।'

'কিন্তু মা'র হার্ট ভালো না। তিনি যে কত কষ্ট পেয়েছেন,' বললেন মারিয়া।

তার উপর দ্মিত্রি বললেন:

'মা'র বয়সও তো হল পঁয়ষট্টি।'

ডাক্তার দাড়িতে টান মারতে মারতে দ্মিত্রির হাতে বইখানার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকালেন।

'শোনো আমার সহযোগী,' তিনি বললেন, 'ওখানে খুঁজে কোন লাভ হবে না! আজও অবধি কোন ডাক্তারী পাঠ্যপুস্তকে মায়ের অন্তরের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয় নি। মায়ের অন্তরের রহস্য চিকিৎসাশাস্ত্রে হেঁয়ালিই রয়ে গেছে। বেশ কিছু মাত্রায় আনন্দই তার জন্যে সবচেয়ে ভালো ওষুধ। তাই আমি তোমাদের মাকে উঠতে বলেছি। কাল আবার এসে তাঁকে দেখব। আমি চললাম। তোমাদের মঙ্গল হোক!'

দ্মিত্রি ডাক্তারের সঙ্গে বাড়ির বাইরে অবধি গেলেন। লেভিৎস্কি এ পরিবারের পুরন প্রিয় বন্ধু। দ্মিত্রি যখন পদল্স্কে নির্বাসনে গেলেন তখন কেউই এই অন্তর্ঘাতক ছাত্রকে সঙ্গে নেবার ঝুঁকি নিতে সাহস করে নি — কারণ, বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্যে দ্মিত্রি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু লেভিৎস্কি তাঁকে সহকারী হিশেবে নিলেন, শুধু তাই নয় — তিনি উলিয়ানভ পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও হয়ে উঠলেন।

দুই বোন মায়ের কামরার দিকে গিয়ে দেখলেন তিনি চুল ঠিক করে, পোশাক ভালভাবে পরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

'মা, কেমন লাগছে তোমার?'

'একটু ভাল,' এই বলে তিনি একটু হাসিখুশি ভাব দেখাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঠিক পেরে উঠলেন না। 'আজ আমি পিটার্সবুর্গ যাব।'

'কিন্তু তোমার যে শরীর ভাল নেই! আমরা তোমাকে যেতে দেব না,' দুই বোন বললেন।

'আমি তো এমন নিশ্চেষ্ট হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি নে। ভালোদিয়ার জন্যে হয়ত কিছু করতে পারব। পুলিস আপিসে গিয়ে আপিল করব।' ছেলেকে বললেন, 'দ্মিত্রি, তুমি রেল স্টেশনে গিয়ে আমার পিটার্সবুর্গ যাবার জন্যে তৃতীয় শ্রেণীর একখানা টিকিট নিয়ে

এসো। একটু গরম জামাকাপড় পরে যেয়ো। আর, গালোশ পরতে ভুলো না যেন। বৃষ্টির তো বিরাম নেই।'

ছেলেমেয়েরা বুঝল মাকে কিছু বলে নিরস্ত করা যাবে না। অন্তত তিনি যাতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যান সেজন্যে ওরা মাকে বুঝিয়ে রাজি করাবার চেষ্টা করল।

'কিছুতেই না,' তিনি আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'প্রতিটা পাই-পয়সাও আমাদের বাঁচিয়ে চলা দরকার। ভালোদিয়ার জন্যে হয়ত উকিল লাগাতে হতে পারে। আনিয়া, একটু দেখ তো আমার তোলা পোশাকটা ইস্ত্রি করা আছে কিনা। মানিয়াশা আর আমি আমার ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছি।'

দ্মিত্রি বর্ষাতি পরে, ফ্রিদ্‌কার দড়িটা তুলে নিয়ে রেল স্টেশনে চললেন। আলমারি থেকে মায়ের কালো পোশাকটা নিয়ে আনিয়া তাতে একটা নতুন সাদা কলার লাগিয়ে দিলেন। পোশাকটাকে সস্নেহে তুলে ধরে তিনি আপন মনে বললেন:

'মা'র বহু লড়াইয়ে চিহ্নিত সেই প্রিয় পুরন পোশাক!'

এ পোশাকটা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে যাবার জন্যে নয়। পুলিসের থানায় কিংবা বিভিন্ন গবর্নর-জেনারেল আপিসে যাবার সময়ে পরবার জন্যেই মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার এ পোশাকটা বিশেষভাবে তৈরি করানো হয়েছিল। যখনই ছেলেমেয়েরা কেউ রাজনীতিক মত-বিশ্বাসের দরুন ফ্যাশাদে পড়ত তখনই তিনি ধৈর্য ধরে কঠিন লড়াইয়ে লেগে যেতেন। 'আপনার আপিল নামঞ্জুর হয়েছে' — এই নির্মম নিষ্ঠুর কথাটা যখন কানে আসত তখন তাঁর বুকের ধুকধুকুনি উঠত কী ব্যাকুল হয়ে, কিংবা হৃৎস্পন্দন থেমেই যেত একবারে, সেটা জানত কেবল ঐ কালো পোশাকটা।

'আপনার বড় ছেলের ফাঁসি হয়েছিল, সেটা ভুলে যাবেন না যেন' — এই শাসানির কথাটা যে তাঁকে কতবার শুনতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আর যতবার কথাটা তিনি শুনেছেন ততবারই নতুন করে তাঁর অন্তরে ব্যথা বেজেছে। কিন্তু তিনি কখনও হাল ছাড়েন নি, নিরাশ হন নি। সরু সরু আঙুলে কলম ধরে তিনি বারবার নতুন আপিল লিখতে বসেছেন। তখনকার রেওয়াজ অনুসারে সে আপিল আরম্ভ হত এই বলে: 'প্রিয় মহাশয়, সবিনয় নিবেদন এই যে...' পুলিস মহাফেজখানায় অমন কত আপিলই ছিল! আপিল নিয়ে দেখাসাক্ষাতের পরে কতবার যে তাঁকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে — আর তখন চোখের জলে ভেজা রুমালখানাকে তিনি জামার পকেটে গুঁজে দিয়েছেন।

*

জানালায় বৃষ্টির বিড়বিড় আওয়াজ। বারান্দায় মুরগী ডাকল। শার্সিতে গাছের ভিজে পাতার ঝাপ্টা।

বিষণ্ন নিস্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ একটা ঘণ্টি বেজে উঠল, আর বাড়িটার ভিতর দিয়ে বয়ে গেল যেন দুরন্ত কালবৈশাখী।

'মা! ভালোদিয়া এসে গেছে!'

মা ছুটে এলেন:

'ভালোদিয়া, আমার জাদুমণি! শরীর ভাল আছে তো? একবারে ছাড়া পেয়েছ তো?'

'আমি খু-উ-ব ভাল আছি। এখন আমি সম্পূর্ণ মুক্ত, আমার আনন্দের সীমা নেই।' ভিজে ওভারকোটটা খুলে রেখে ভ্লাদিমির ইলিচ মাকে জড়িয়ে ধরলেন।

দ্মিত্রি ইলিচ উত্তেজিতভাবে জানালেন:

'আমার স্টেশনে যাবার পথে দেখা হয়ে গেল। দেখলাম খানা-খাতগুলোর উপর দিয়ে কে যেন খুব জোর পায়ে এগিয়ে আসছে — ভাবলাম এই ছোট্ট পদল্স্ক শহরে এত ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলেছে কে! একটু ভাল করে তাকিয়ে দেখি — সে!'

মারিয়া ইলিনিচ্না বললেন:

'ভালোদিয়া, আমাকে একটু চিমটি কাটো তো — মনে হচ্ছে আমি যেন স্বপ্ন দেখছি!'

'আনিয়া, জলদি সরিয়ে নিয়ে যাও আমার কালো পোশাকটা,' বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'এখন ওটার আর দরকার নেই!'

'এখুনই নিয়ে যাব,' এই বলে আন্না ইলিনিচ্না পোশাকটাকে ঝুলিয়ে রেখে আলমারির দরজা এঁটে বন্ধ করে দিলেন — তাঁর যেন ভয় পাছে পোশাকটা কোনমতে আবার বেরিয়ে পড়ে সবার আনন্দে ব্যাঘাত ঘটায়। ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন:

'এসো, আবার তোমাকে চুমু খাই।'

বোনেরা টেবিলে খাবারদাবার সাজাতে ব্যস্ত। সামোভারের ভার দ্মিত্রি ইলিচের উপর। ফ্রিদ্কা এ-ঘর ও-ঘর করছে, তার জিবটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, নবাগতের জন্যে সে লেজ নাড়ছে, আর লোমশ মাথাটা ঘষছে তাঁর পায়ে — সেও যেন সবার সুখ স্বস্তির ভাগীদার।

'বেশ, বেশ,' এই বলে ভ্লাদিমির ইলিচ কুকুরটার মাথায় আদর করে চাপড়ে দিলেন, 'কোন পুলিসের লোক এসে পড়লে আমাদের হুঁশিয়ারি জানিয়ে দিয়ো!'

এরপরে ফ্রিদ্কা যেন ব্যাপারটা বুঝে পা টেনে টেনে হল-ঘরে গিয়ে দরজার কাছে শুয়ে থাকল।

ছোট কাঠের বাড়িটায় আবার ফিরে এল হাসি আর খুশি।

ভ্লাদিমির ইলিচ মাকে আস্তে টেনে বসালেন কৌচে নিজের পাশে।

'আঃ, বাড়িতে! এ বড় খাসা! রোদ উঠলে কী চমৎকার হবে!'

'চমৎকার বাদলা দিনেও,' সুখী মা বললেন, 'দেখ না, বৃষ্টি সবকিছুকে কেমন তাজা করে দিচ্ছে।'

আন্না ইলিনিচ্না বললেন:

'আচ্ছা, ভালোদিয়া, বলো তো তুমি ধরা পড়লে কী করে, আর ছাড়া পেলেই বা কিভাবে।'

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা সামোভারের কাছে বসে সবার পেয়ালায় চা ঢেলে দিলেন।

চাপা হাসি মুখে ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন:

'পিটার্সবুর্গ পৌঁছেই বুঝলাম পিছনে টিকটিকি লেগেছে। পুলিস যখন আমাকে ধরেই ফেলল তখন একমাত্র চিন্তা ছিল কি করে পকেট খালি করি, কিন্তু বৃথা চিন্তা! দুটো প্রকাণ্ড জানোয়ার আমার দু' বাহু ধরে মুচড়ে পিছনে টেনে রেখেছিল, আর একটা জানোয়ার নজর

রাখছিল যাতে আমি কিছু গিলে না ফেলি। পকেটে কি ছিল জানো? ছিল — সংবাদপত্রের জন্যে সংগ্রহ করা দু' হাজার রুবল, প্লেখানভের* কাছে লেখা একখানা লম্বা চিঠি — তাতে কাগজের ব্যবস্থা করবার বিশদ পরিকল্পনা, নানা গুপ্ত ঠিকানা আর বিভিন্ন সাংকেতিক শব্দ।'

মারিয়া ইলিনিচ্না বললেন:

'আমার তো ভাবতেও গা শিউরে উঠছে।'

'কিন্তু,' ভ্লাদিমির ইলিচ একটা আঙুল তুলে বললেন, 'দুধ, লেবুর রস এবং আরও নানা খাবার জিনিস দিয়ে সব লেখা ছিল, তাছাড়া, লেখা ছিল পুরন সব বিল আর রসিদের লাইনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে। এইভাবে গিয়ে পড়লাম আমার জেলের খোপে। তখন আমার মাথায় শুধু ভাবনা যে, ঐসব কাগজে গরম ইস্তিরি লাগাবার বুদ্ধি পুলিসের আছে কিনা।'

'তারপর?' অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মারিয়া ইলিনিচ্না।

'দশ দিন পরে আমাকে নিয়ে গেল জেইলরের আপিসে। আমাকে বলে দিল পিটার্সবুর্গে এবং আরও যাটটা শহরে আমার যাওয়া নিষেধ, তাছাড়া, কোন কারণেই আমি প্স্কভ ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। আমার সমস্ত কাগজপত্র, রসিদ, টাকা সব ফেরত দিল — তখন তো আমার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ওরা ছিল কতকগুলো একবারে যাকে বলে আকাট মুর্খ। তখন আমি সবিনয়ে বললাম যে, তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

পুলিস কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিচকে একলা ছেড়ে দেয় নি। একজন পাহারাদার পদল্স্ক শহর অবধি এসে তাঁকে স্থানীয় পুলিসের কর্তার হাতে দিয়ে গেল।

সেখানে আবার এক নতুন ফ্যাশাদ। পুলিসের কর্তাটি ভ্লাদিমির ইলিচের বৈদেশিক পাসপোর্ট দেখতে নিয়ে সেটার পাতা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ সেটাকে নিজের ডেস্কে পুরে রাখল। সে বলল:

'আপনার তো বিদেশে যাবার দরকার নেই — কাজেই, ওটা আমার কাছেই নিরাপদে থাকুক।'

'আমি তো রেগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম,' ভ্লাদিমির ইলিচ বলে চললেন, 'বুড়ো শেয়ালটা আমাদের সংবাদপত্রের সমস্ত পরিকল্পনা তার টানা দেরাজে পুরে ফেলল। আমি সত্যিই ভীষণ রেগে বললাম যে, তার এই বেআইনী কাজের জন্যে আমি তার উপরওয়ালাদের কাছে নালিশ করব। আমি সত্যিই শোরগোলই লাগিয়েছিলাম নিশ্চয়ই: বুড়োটা ভয় পেয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি টানা দেরাজটা খুলল। আমি চলে যাবার জন্যে ফিরবার মুখে দেখে, আমার পাসপোর্ট ফেরত নেবার জন্যে সে মিনতি জানিয়ে বলল আমি যেন নালিশ না করি।'

এই অবধি বলে ভ্লাদিমির ইলিচ খুব খুশি হয়ে হাসতে হাসতে মাথাটা পিছনে কৌচের উপর হেলিয়ে দিলেন।

মারিয়া ইলিনিচ্নাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হাসতে থাকলেন। মা বললেন:

'তুমি তাহলে বৈদেশিক পাসপোর্ট পেয়েছ?' এতে তিনি যে কত মর্মাহত হয়েছেন সেটা তিনি ছেলের কাছে গোপন করবার চেষ্টা করলেন।

---

* গেওর্গি প্লেখানভ (১৮৫৬—১৯১৮) — রুশ বিপ্লবী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। বিশিষ্ট মার্কসবাদী তত্ত্ববিৎ এবং প্রবন্ধকার।

'হ্যাঁ, মা, আমার জার্মানিতে যেতে হবেই,' এই বলে ভ্লাদিমির ইলিচ উঠে দরজায় খিল এঁটে জানালা শক্ত করে বন্ধ করে দিলেন — এটা তাঁর দীর্ঘকালের সতর্কতার অভ্যাস। তারপরে গলা খাটো করে বললেন:

'একটা বড় রকমের পরিকল্পনা আছে আমাদের। আমরা একটা সংবাদপত্র প্রকাশ করব।'

সবচেয়ে প্রিয় এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন উত্তেজিতভাবে। শ্রমিকেরা সর্বত্র আরও বেশি জঙ্গী হয়ে উঠছে। চাই একটা কেন্দ্রীয় মুখপত্র — এই মুখপত্র মুক্তির জন্যে আর জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করবে। চাই একটা সারা রাশিয়ার সংবাদপত্র। কোটি কোটি শ্রমিক আর কৃষকের সামনে যা কাজ সেটা বুঝিয়ে বলবে এই সংবাদপত্র। এই সংবাদপত্র একটা সমগ্র কর্মসূচি রচনা করবে। সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে থাকবার সময়ে তিনি এবং তাঁর সহকর্মী বিপ্লবীরা মিলে এই রকমের সংবাদপত্র স্থাপন করবার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পুলিসের অত্যাচারের দরুন এমন সংবাদপত্র রাশিয়ায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই ঠিক হয়েছে সেটা প্রকাশ করা হবে বিদেশ থেকে। তারপর সেই কাগজ গোপনে রাশিয়ায় আনানো হবে — তখন সব বিশ্বস্ত লোক শ্রমিকদের মধ্যে এই সংবাদপত্র বিলি করবে।

ভ্লাদিমির ইলিচ ইতোমধ্যে রিগা, স্মোলেন্স্ক, পিটার্সবুর্গ আর মস্কো ঘুরে এসেছেন। যেসব কেন্দ্র থেকে সংবাদপত্র বিলি হবে সেগুলি তিনি ঐ সফরের সময়ে ঠিক করে এসেছেন। বিভিন্ন কমরেডের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সংবাদপত্রের জন্যে তাদের প্রবন্ধ পাঠাবার ব্যবস্থাও তিনি করে এসেছেন।

'কী নাম হবে এই কাগজের?' জিজ্ঞাসা করলেন আন্না ইলিনিচ্না।

''ইস্ক্রা'*। 'একটা স্ফুলিঙ্গ শিখা জ্বালিয়ে দেবে।' মনে আছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বললেন মারিয়া ইলিনিচ্না, 'পুশকিনের** কাছে ডিসেম্ব্রিস্টদের*** উত্তরের মধ্যে ঐ লাইনটা আছে।'

ছেলেমেয়েদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বুঝলেন এটা কী বিরাট ব্যাপার হতে যাচ্ছে। তিনি ফিসফিস করে বললেন:

'তোমাদের অভীষ্টসিদ্ধি হোক! তোমাদের কল্যাণ হোক!'

'হ্যাঁ, ভাল কথা। আনিয়া, তোমার জন্যেও কিছু পরিকল্পনা আছে,' ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন, 'আমার পরে জার্মানিতে গিয়ে তুমি সাংগঠনিক কাজে সাহায্য করবে। নাদিয়ার নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেও আমাদের কাছে চলে যাবে।'

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন:

'তখন আনিয়া সত্যিকারের লেখিকা হয়ে উঠতে পারবে।'

---

* ইস্ক্রা [রুশ ভাষায়] — স্ফুলিঙ্গ।

** আলেক্সান্দর পুশকিন (১৭৯৯—১৮৩৭) — রাশিয়ার অন্যতম মহাকবি।

*** রাশিয়ার অভিজাতদের ভিতর থেকে বিপ্লবীদের নাম ছিল ডিসেম্ব্রিস্ট; তাঁরা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন এবং ১৮২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁরা পিটার্সবুর্গে একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করেছিলেন।

আন্না ইলিনিচ্‌নার মুখখানা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বরাবর তিনি সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি ছোটদের জন্যে গল্প লিখেছেন, আর ইতালীয়, ইংরেজি আর জার্মান ভাষার বিভিন্ন বই রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন। কিন্তু এবার আসছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর সম্মানের কাজ: শ্রমিকদের জন্যে সংবাদপত্র প্রকাশ করবার কাজ।

'আহা, আমি যদি ভলগা দিয়ে সামারা আর নিজনি নভগরোদ হয়ে, আর সীজ্‌রান্‌ হয়ে যেতে পারতাম যেখানে নাদিয়া আছে!'

'জানি, তার জন্যে তোমার মন কেমন করে,' মা বললেন বিমর্ষ মুখে।

'সত্যি! আমাদের ছাড়াছাড়ি হল এই প্রথম। তাছাড়া, ও সেখানে স্থানীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। ওদের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ করতে ইচ্ছে করে। সর্বত্র অগ্নিকুণ্ড সাজাতে হবে। শ্রমিকেরা সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত। রাশিয়ায় দাহ্য পদার্থ জমে উঠছে ক্রমাগত বেশি বেশি পরিমাণে। সেগুলিকে জ্বালিয়ে দেবার স্ফুলিঙ্গ হবে 'ইস্ক্রা'।'

মা বললেন:

'সেখানে যাবার জন্যে পুলিসের অনুমতি চাইতে পারো না?'

'ভেবেছ, সে চেষ্টা আমি ইতোমধ্যে করি নি? তারা সরাসরি 'না' বলে দিয়েছে।'

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা চিন্তান্বিতা হলেন। তিনি বললেন:

'উপরে চলো — তোমার কামরা দেখিয়ে দেব।'

ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করা সিঁড়ি বেয়ে ওঁরা উপরে উঠলেন।

হাত তুলে ছাদ ছুঁয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ বলে উঠলেন:

'ঠিক আমার সিম্‌বির্স্কের কামরাটার মতো!'

বাঁদিকের দেয়াল ঘেঁষে একখানা লোহার খাট — তাতে বিছানার উপর একখানা ছক-কাটা মোটা কম্বল বিছানো। ডানদিকে একটা জানালা, আর একটা দরজা খুললে ঝুলবারান্দা। জানালার কাছে একখানা ছোট টেবিল — তাতে সবুজ ঢাকনা দেওয়া একটা বাতি। ছোট বইয়ের তাকে গাদা করা রয়েছে তাঁর প্রিয় লেখকদের বই।

'সত্যিকারের বিশ্রাম হবে এটা,' ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন, 'কাজের পক্ষেও অনুকূল। কয়েকজন কমরেডকে চিঠি লিখে এখানে আসতে বলেছি — এখানে আমরা সমস্ত বিষয়ে কথাবার্তা বলে নিতে পারি। তারা না আসা অবধি সময়টা পুরোপুরি তোমার সঙ্গে কাটবে।'

ভ্লাদিমির ইলিচ দরজা খুলে ঝুলবারান্দায় গেলেন। বৃষ্টি থেমেছে। বাগান থেকে ফুলের গন্ধ আসছে। রোদ উঠতেই পাখিগুলো পরম আনন্দে চড়া গলায় গান ধরেছে।

'মা, চলো, বাগানে বেড়াতে যাই। কিন্তু ওভারকোট পরে নাও, আর গালোশ পরো যাতে পায়ে জল না লাগে। তুমি তো সব সময়েই আমাদের বল ঐ কথা,' বললেন ভ্লাদিমির ইলিচ।

ছেলের দিকে মুখ তুলে তাকাতে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

'শোনো আমার জাদুমণি, তুমি নাদিয়াকেও দেখতে পাবে, আর ভলগার পাড় বরাবর অগ্নিকুণ্ড সাজাতে পারবে — তার একটা উপায় আমি ভেবে বের করেছি।'

'কী করে?'

'আচ্ছা, আর যাই হোক, আমার ছেলের বউয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়া চাই তো,' কথাটা বলতে বলতে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার হাসি-মাখা চোখ দুটোর কোণে কোণে ছোট্ট মাকড়সার জালের মতো বলিরেখাগুলো ফুটে উঠল।

'কী বলছ তুমি? নাদিয়াকে তুমি তো বেশ ভালভাবেই চেন।'

'কিন্তু পুলিস তো সেটা জানে না। তুমি নির্বাসনে থাকবার সময়ে বিয়ে করেছ — ফিরবার সময়ে তুমি বউকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে আসতে পার নি।'

'পুলিস তাকে আসতে নিষেধ করেছিল। নাদিয়ার মেয়াদের এখনও ছ'মাস বাকি আছে।'

'কিন্তু আমি তোমার বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই। মা হিশেবে সে অধিকার আমার আছে ষোলআনাই। কোন আইন আমার এ অধিকার নাকচ করতে পারে না। পিটার্সবুর্গ গিয়ে আমি অনুরোধ জানাব।'

'কিন্তু তোমার যাবার জন্যে তো কারও অনুমতির দরকার নেই।'

'আমাকে একলা যেতে দেবার কথা তুমি ভাবতেই বা পারলে কেমন করে? আমার বয়স পঁয়ষট্টি, তার উপর হার্ট্ ভাল না...' এই বলেই তাড়াতাড়ি জুড়ে দিলেন যে, 'না, চিন্তার কিছু নেই — হার্ট্ আমার সত্যিই খুব ভাল। তবে, স্ত্রীকে মায়ের কাছে হাজির করাটা ছেলের কর্তব্যই। তাই তোমার যাওয়া দরকার। আমি পিটার্সবুর্গ যাচ্ছি কাল।'

ভ্লাদিমির ইলিচ মাকে জড়িয়ে ধরলেন।

ঠিক তখনই সেখানে এলেন তাঁর বোন আন্না ইলিনিচ্না।

'কামরাটা তোমার কেমন লাগল, ভালোদিয়া? তোমাকে দেখাবার জন্যে মা'র আর একটুও দেরি সইছিল না।'

ভ্লাদিমির ইলিচ কিছুই বললেন না। মনে হচ্ছিল তিনি যেমন খুশি, তেমনি একটু অপ্রতিভ।

'আমি পিটার্সবুর্গ যাব,' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন মেয়েকে, 'আমার কালো পোশাকটা আবার বের করতেই হচ্ছে। দমিত্রিকে বলো রেল স্টেশনে গিয়ে আমার টিকিট নিয়ে আসুক। এবার আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে যেতে রাজি।'

*

ডাঃ লেভিৎস্কি এলেন পরদিন সকালে। দমিত্রি ইলিচকে তিনি বললেন:

'তোমার মা তো বেশ ভালই আছেন।'

'আপনি খুব ঠিক কথাই বলেছিলেন। খুব ভাল এক মাত্রা আনন্দই সবচেয়ে ভাল ওষুধ। চলুন আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবেন, চলুন।' এই বলে দমিত্রি ইলিচ ডাক্তারকে ফল বাগানের পথে নিয়ে চললেন।

লেভিৎস্কি জানতেন যে, ভ্লাদিমির ইলিচ বিপ্লবী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ভেবেছিলেন দেখবেন চশমা-পরা, ছড়ি হাতে গুরুগম্ভীর এক ভদ্রলোক প্রশান্তভাবে পায়চারি করছেন। কিন্তু তিনি দেখলেন গাঁট্টাগোট্টা এক তরুণ — তাঁর কাঁধে একটা ক্রোকেট খেলার মুগুর: দেখে তিনি অবাক হলেন।

বোন মানিয়াশা ডাবল উইকেটের ভিতর দিয়ে বল পার করাতে পারে কিনা তাই দেখছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ।

'সাবাস, সাবাস!' তিনি সোৎসাহে বলে উঠলেন।

মুগুরটাকে অন্য কাঁধে নিয়ে তিনি লেভিৎস্কির সঙ্গে করমর্দন করে জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তারও খেলায় যোগ দিতে চান কিনা। কথা বলতে বলতে ভ্লাদিমির ইলিচ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে ডাক্তারকে দেখে নিচ্ছিলেন। লেভিৎস্কি তাঁর চেয়ে দু'এক বছরের ছোট। তাঁর সুন্দর মুখখানা ঘিরে বাদামী রঙের ঘন দাড়ি আর রেশমের মতো চুল। তাঁর কোটরে-বসা ধূসর চোখ দুটোয় বুদ্ধির দীপ্তি আর চরিত্র বৈশিষ্ট্যের ছাপ। সব মিলিয়ে একটি সহৃদয় এবং পবিত্র-দর্শন তরুণ।

দ্মিত্রি ইলিচ লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর ভাই আর ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গেই পরস্পরকে পছন্দ করেছেন।

রবিবার দিন। ভ্লাদিমির ইলিচ নৌকো করে বেড়াতে যাবার কথা তুললেন।

এই নতুন বন্ধুর সঙ্গে লেভিৎস্কি একটুও অস্বস্তি বোধ করলেন না। এই পরিবারটিকে তিনি পছন্দ করতেন: এ পরিবারে প্রত্যেকের কত রকমের আগ্রহের বিষয়, প্রত্যেকে সংস্কৃতিমান, হাসিখুশি, মিশুক; তিনি বরাবরই এ পরিবারের বন্ধু হয়ে থাকতে চান।

পাখরা নদীতে দ্রুত দাঁড় বেয়ে নৌকো চালাতে চালাতে ভ্লাদিমির ইলিচ লেভিৎস্কিকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করছিলেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল — যেমন, পদল্স্ক অঞ্চলে শিশু-মৃত্যুহার এত বেশি কেন, কিংবা বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি থেকে এত বেশি লোককে ডাক্তারী কারণে রেহাই দেওয়া হচ্ছে কেন।

লেভিৎস্কি বললেন:

'বিখ্যাত পদল্স্ক ফেল্ট হ্যাটই এর কারণ।'

ভ্লাদিমির ইলিচ অবাক হয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। বললেন:

'কথাটা তো ঠিক বুঝতে পারছি নে।'

লেভিৎস্কি বললেন:

'পদল্স্ক অঞ্চলের বাসিন্দাদের শারীরিক বিকাশ নিয়ে আমি একটা গবেষণা চালাচ্ছি। পারদের বিষাক্ত ধোঁয়ার দরুন এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের সর্বক্ষণ স্বাস্থ্যহানি ঘটছে সেটা আমি প্রমাণ করেছি। ফেল্ট তৈরি করতে র‍্যাবিটের লোম লাগে — সেই লোম কাজে লাগাবার উপযোগী করবার জন্যে স্থানীয় কারখানার মালিকেরা পারদ ব্যবহার করে। তার মানে প্রত্যেকটা টুপি এক এক জন মানুষের জীবন নষ্ট করে। উৎপাদনের এই বর্বর প্রণালীর বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানিয়েছি, কিন্তু কারখানার মালিকেরা ঠিক কারখানা-মালিকই বটে। লাভ হলে তারা শ্রমিক কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না।'

'ঠিকই বলেছেন,' ভ্লাদিমির ইলিচ সায় দিয়ে বললেন, 'তা, কি করবেন ভাবছেন?'

'আমি পড়েছি, ফ্রান্সে একটা অন্য উপায়ে ফেল্ট তৈরি করা হয়। তারা পারদের বদলে ব্যবহার করে কস্টিক পটাশ।'

'শ্রমিকদের শরীরে বিষক্রিয়া ঘটানো হচ্ছে একবারে প্রণালীবদ্ধভাবেই, এ কথা কি তারা জানে?'

'কারখানার মালিক, ছোট ছোট কারিগর আর শ্রমিকদের সঙ্গেও আমি কথা বলেছি — কিন্তু কাজ ছাড়া তো এদের পক্ষে সম্ভব নয়। এদের তো রুজি-রোজগারের অন্য কোন উপায় নেই।'

'কত জন শ্রমিকের সঙ্গে আপনি কথা বলেছেন সেটা খেয়াল করে বলতে পারেন?'

'তা ডজন ডজন হব।'

'আমার মনে হয় রাশিয়ার সমস্ত শ্রমিকের এটা জানা দরকার। তেমনি, পদল্স্ক শ্রমিকদেরও জানতে হবে যে, দন্ নদী বরাবর খনিগুলোতে শ্রমিকেরা কী অমানুষিক অবস্থায় কাজ করে, আর, কী অমানুষিক অবস্থায় কাজ করে ইভানভো-ভজনেসেনস্ক কাপড়ের কারখানার শ্রমিকেরা, কিংবা লেনা নদীর সোনার খনিগুলো থেকে যারা সোনা তোলে।'

'সেটা করা যায় কীভাবে?'

'তাদের জানতে হবে নিজস্ব সংবাদপত্র মারফত। শুধু তাই নয়। কারখানা-মালিকদের বিরুদ্ধে কী করে সংগঠিতভাবে লড়তে হয় সেটাও তাদের শেখাতে হবে। যে পথে তাদের মুক্তি আসবে সেই পথটা তাদের দেখিয়ে দেওয়া দরকার।'

লেভিৎস্কির মুখে ফুটল তিক্ত হাসি। তিনি বললেন:

'কোন কাগজ তা ছাপাতে রাজি হবে?'

'আমি বলছি সেটা কোন কাগজ। তার নাম 'ইস্ক্রা'। এখানকার কারখানার অবস্থা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখবেন আপনি? প্রবন্ধটা ভাই দ্মিত্রির হাতে দিলে সে ঠিক জায়গামতো পৌঁছে দেবে।'

নৌকোখানার দাঁড় নামিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ নদীর অন্য পাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নদীর জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে রয়েছে গোলাপী রঙের গাছের ঘন ঝাড়গুলো। তার একটু উপরে বনের একটা ফাঁকা জায়গা ছেয়ে আছে প্রকাণ্ড একটা উইলোগাছ — তার মাঝে মাঝে ফুটে আছে তারাফুল। উইলোগাছের ডালপালার ভিতর দিয়ে ঝিকমিক করছে ফালি ফালি রোদ।

'প্রকৃতির কী শোভা! আর এখানে তাজা হাওয়ার মহাসাগর! অথচ, এই অতি চমৎকার জায়গাটাতে যারা থাকে তারা মরছে পারদের ধোঁয়ার বিষে, আর তাদের সন্তানসন্ততির হয় রিকিট্স্। আমাদের কাগজ শ্রমিকদের শেখাবে কী করে নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে হয়।'

'ঠিক বলেছেন। এমন কাগজ সত্যি যদি থাকে...'

'হবে সে পত্রিকা। হবেই — এ আমি বলছি, লেভিৎস্কি ভাই!'

বাড়ি ফিরে ভ্লাদিমির ইলিচ এ-কামরা ও-কামরা পায়চারি করছিলেন, আর খুশি মনে হাতে হাত ঘষছিলেন। হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে ভাইকে তিনি বললেন:

'তোমার ডাক্তার মানুষটিকে বেশ মনে ধরে! বলা যায় ধড়ের উপর মাথা আছে বটে। ওঁকে চাঙ্গা করে রেখো, 'ইস্ক্রার' জন্যে ওঁকে দিয়ে লেখাবে, আর মার্কসের কিছু বই পড়তে দিও। খুব চমৎকার মানুষ!'

*

সেদিন সন্ধ্যায় ওঁরা সবাই গিয়ে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে পিটার্সবুর্গের ট্রেনে তুলে দিলেন। ছেড়ে যাওয়া ট্রেনখানার দিকে তাকিয়ে আন্না ইলিনিচনা বললেন:

'মা'র এই যাওয়াটা নিতান্তই নিরর্থক। ওরা কিছুতেই রাজি হবে না।'

'সাধ্যে যা আছে সবই করেছেন, অন্তত এইটুকু জেনে শান্ত্বনা পাবেন,' বললেন মারিয়া ইলিনিচ্না।

ভ্লাদিমির ইলিচ সবাইকে বললেন:

'মা যতক্ষণ বাড়িতে নেই তার মধ্যে যতখানি সম্ভব কাজ করে ফেলতে হবে। তাহলে তিনি ফিরলে তাঁর সঙ্গে কাটাবার সময় পাওয়া যাবে।'

একটা 'গুপ্ত নোট্‌বই' হিশেবে ব্যবহার করবার জন্যে তিনি ভাইয়ের কাছে একটাকিছু চাইলেন, যেটা এমনি দেখতে নিতান্ত সাদামাঠা মনে হবে। দ্‌মিত্রি ইলিচ সদ্য প্রাপ্ত 'বিজ্ঞান পরিক্রমা' পত্রিকার মে মাসের সংখ্যাটা দিলেন। বেশ মোটাসোটা এই পত্রিকাখানা খুবই যুৎসই হবে। পত্রিকাখানার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ভ্লাদিমির ইলিচ একটা প্রবন্ধ দেখে থামলেন: প্রবন্ধটার লেখক স. চুগুনোভ্, শিরোনামা — 'অভিব্যক্তি তত্ত্ব অনুসারে মানুষের পাঁজরের বিচার'।

'এতে ঠিক চলবে,' তিনি বললেন, 'এর লাইনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আমরা লিখে ফেলব রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির 'খসড়া কর্মসূচি'। এইভাবে সেটা সীমান্ত পার হয়ে যাবে।'

মারিয়া ইলিনিচ্না একটা পেয়ালা ভরতি করে দুধ ঢেলে নিলেন। কলমে একটা নতুন ইস্পাতের নিব্ লাগিয়ে তিনি 'মানুষের পাঁজরের' প্রবন্ধটার লাইনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে লিখতে আরম্ভ করলেন। 'খসড়া কর্মসূচিটাকে' তিনি নকল করে তুলছিলেন। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লে কাজটা ধরলেন দ্‌মিত্রি ইলিচ।

শনিবারে মস্কো থেকে এলেন আন্না ইলিনিচ্নার স্বামী মার্ক তিমোফেয়েভিচ। ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁকে পরিকল্পনাটা বললেন। একটা 'গুপ্ত টেবিল' তৈরি করা নিয়ে দুজনের রাত কেটে গেল। এমন টেবিলে পার্টির দলিলপত্র লুকিয়ে রাখা যাবে, অথচ পুলিসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেখানে পড়বে না। মার্ক তিমোফেয়েভিচ যখন নকশাটা শেষ করলেন তখন চিলেকোঠা ভোরের সূর্যের কিরণে ভরে গেছে।

টেবিলখানা হবে দাবাখেলার টেবিল, তাতে একশ'-খোপী ছকে চার জনে খেলতে পারবে। সেটা হবে গোল — তার বাঁকানো পায়া থাকবে তিনটে। উপরটা হবে জটিল ডিজাইনের একটা কাঠাম — তাতে থাকবে অনেকগুলো ছোট ড্রয়ার, সবার উপরে থাকবে প্যানেল করা দাবার ছক। প্যানেলের কাজে একটা পেরেক হবে আল্। সেটাকে সরিয়ে নিলে নিচে গুপ্ত খুপরিটা বেরিয়ে পড়বে।

ভ্লাদিমির ইলিচ খুশি হয়ে বললেন:

'পুলিসের নজর যাবে ছোট্ট ড্রয়ারগুলোরই দিকে। প্যানেল করার দরুন টেবিলের উপরটার আসল গভীরতা ধরা পড়বে না। ডিজাইনটা চমৎকার!' ভ্লাদিমির ইলিচ খুশি হয়ে বললেন, 'এখন চাই একজন ভাল ছুতারমিস্ত্রি, যাকে ষোলআনা বিশ্বাস করা যায়।'

মার্ক তিমোফেয়েভিচ বললেন:

'ঠিক তেমনি একজনই আমার জানা আছে। তার সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।'

এই ওস্তাদ ছুতারমিস্ত্রির নামের উল্লেখ কোথাও নেই; কিন্তু তিনি যে টেবিল তৈরি করে দিয়েছিলেন তার গুপ্ত খুপরিতে অক্টোবর বিপ্লবের জয় অবধি দীর্ঘ সতের বছর যাবত পার্টির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র লুকিয়ে রাখা গিয়েছিল। পুলিস অনেকবার ড্রয়ারগুলো টেনে বের করে, টেবিলখানাকে উল্টে ফেলে, সব দিক থেকে ঠোকর মেরে, টোকা মেরে দেখেছে — সেটাকে বার বার এক রকম খুলেই ফেলেছে; কিন্তু ছোট্ট টেবিলখানার রহস্য তাদের কাছে কখনও ধরা পড়ে নি। তাই, মস্কোয় লেনিন কেন্দ্রীয় মিউজিয়মে একটা বিশিষ্ট জায়গায় টেবিলখানা রাখা আছে।

যাঁরা রাশিয়ায় থাকতেন সেইসব কমরেডের কাছে লেনিনের লেখা চিঠিপত্র পুলিস নিশ্চয়ই খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত। কাজেই খুব ভাল সংকেত পদ্ধতি দরকার ছিল। তার অর্থ উদ্ধার করবার উপায়ও সহজ সরল হওয়া দরকার ছিল — অথচ, সেটা এমন হওয়া চাই যাতে পুলিসের অভিজ্ঞ সংকেত-ধরা লোকেরা তার অর্থ উদ্ধার করতে না পারে। ভ্লাদিমির ইলিচ বিভিন্ন সংকেত পদ্ধতি উদ্ভাবন করে সেগুলিকে পরীক্ষা করেছিলেন। এ কাজ তিনি করতেন গণিতজ্ঞের মতো নিখুঁতভাবে, আর কবির মতো অনুপ্রাণিত হয়ে। কোন কমরেড গ্রেপ্তার হলে তাঁর স্বাস্থ্য এবং মন মেজাজ ঠিক রাখবার উপায় নিয়েও তাঁকে ভাবতে হত।

ভ্লাদিমির ইলিচ একবার ভাই দ্মিত্রি ইলিচকে বলেছিলেন:

'তুমি তো শিগগিরই পুরোপুরি ডাক্তার হয়ে যাবে — আমাকে কিছু ডাক্তারী পরামর্শ দাও তো। সশ্রম কারাদন্ড হলে জেলে স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হলে কী করা দরকার? আমি যখন জেলে ছিলাম তখন সুযোগ পেলেই বারান্দায় কিংবা নিজের খোপের মেঝে পরিষ্কার করতাম। এতে বেশ ব্যায়াম করা হয় — তবে, সেটা যথেষ্ট নয়। জেলে যাতে লোকের দৈহিক শক্তি বজায় থাকে এবং ইচ্ছাশক্তি যাতে দৃঢ় হয় তার একটা বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্যবিধি দরকার।'

অবাক হয়ে দাদার দিকে তাকিয়ে দ্মিত্রি ইলিচ জিজ্ঞাসা করলেন:

'তুমি সশ্রম কারাদণ্ডের কথা নিয়ে ভাবছ কেন? তুমি তো বিদেশে যাচ্ছ — তাই না?'

'কখন কি হয় বলা যায় না। আমি তো চিরকালের মতো বাইরে যাচ্ছি নে। তাছাড়া, এ রকমের পরামর্শ আমাদের সমস্ত কমরেডেরই পাওয়া দরকার। গ্রেপ্তার হলে কী করে জেলে সুস্থ থাকা যায় সেটা সবারই জানা দরকার।'

একদিন তাম্বভ অঞ্চল থেকে এলেন শেস্তের্নিন দম্পতি। তারপরে শিগগিরই এলেন পান্তেলেইমন নিকোলায়েভিচ লেপেশিন্স্কি — এই বিপ্লবীর সঙ্গে ভ্লাদিমির ইলিচ একত্রে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে ছিলেন।

পাখরা নদীর ধারে ছোট কাঠের বাড়িটা যেন সামরিক সদরঘাঁটির মতো হয়ে উঠেছিল। নওজোয়ানেরা খাবার ঘরে বসে চাপা গলায় আলোচনা করতে থাকলে ফ্রিদ্কা হল-ঘরে দরজার কাছে ঘাঁটি আগলায়। কিন্তু ক্রোকেই খেলার মুগুর নিয়ে সবাইকে ফল বাগানের দিকে যেতে দেখলে ফ্রিদ্কা একটা কাঠের বল্ মুখে নিয়ে বাগানের পথে ছুটোছুটি করে। এই ছোট বাড়িটার সবাই সকালে নদীতে স্নান করতে গেলে ফ্রিদ্কা পাড়ে বসে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে সবার উপর নজর

রাখে। তার সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের কারণ হলেন ভ্লাদিমির ইলিচ। কখনও তিনি ভেসে ভেসে সাঁতার কাটেন, আবার পরমুহূর্তে তিনি জলের তলে অদৃশ্য হয়ে যান। ফ্রিদ্‌কা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে তাঁর দিকে মাথা বাড়ায়। তিনি নেই—তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অমনি ফ্রিদ্‌কা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ততক্ষণে ভ্লাদিমির ইলিচ দম নেবার জন্যে নদীর অন্য পাড়ের কাছে ভেসে ওঠেন। খুশি মনে হাসতে হাসতে তিনি ডাঙায় ওঠেন।

'ভয় পাইয়ে দিয়েছি তোকে — না রে?' ফ্রিদ্‌কার ভিজে গলাটায় আদর করে চাপড় দিতে দিতে তিনি বলেন, 'ভেবেছিলি আমি ডুবে গেলাম?'

সেদিন সন্ধ্যায় ওঁদের বাড়িওয়ালীর বাড়িতে এল পুলিসের কর্তা। সে জানতে চাইছিল, উলিয়ানভদের বাড়িতে কী হচ্ছে, এসেছে কারা, তারা গুপ্ত বৈঠক করছে কিংবা জারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ফাঁদছে কিনা।

বাড়িওয়ালী পুলিসের কর্তাটির দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। তিনি তাকে তাঁর সঙ্গে বাইরে আসতে বললেন। বেড়ার ওধার থেকে খুশির হাসি শোনা যাচ্ছিল। শোনা যাচ্ছিল কাঠের বল্‌-এর খটখটানি। একটা সামোভার থেকে নীল ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা পাক খেয়ে খেয়ে আসছিল ওদের দিকে।

মিঠে গলায় একটা গান আরম্ভ হল।

'গাইছে কে?' জিজ্ঞাসা করল পুলিসের কর্তা।

বাড়িওয়ালী বললেন:

'ঐ হলেন উলিয়ানভদের বড় ছেলে — ভ্লাদিমির ইলিচ।'

'যে সবে সাইবেরিয়ার নির্বাসন থেকে ফিরেছে?'

'উনি কোথায় ছিলেন না-ছিলেন সেটা তো মনে হয় আপনিই ভাল জানেন। তবে, উনিই হাসেন সবচেয়ে জোরে, আর সব সময়েই শিস দেন কিংবা গান করেন। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে উনি সাঁতার কাটতে যান রোজ সকালে। জানি নে কী শুনেছেন ওঁর সম্বন্ধে — কিন্তু সেসব সত্যি নয়। বিপ্লবীরা অমনভাবে সময় কাটায় না। এঁরা সবাই অত্যন্ত সদাচারী,' সশ্রদ্ধভাবে এই কথা বলে থামলেন বাড়ির মালিক।

হঠাৎ বেড়ার উপর দেখা দিল ফ্রিদ্‌কার প্রকাণ্ড মাথাটা। পুলিসের লোকটার উর্দি দেখে সে দাঁত খিঁচল। তার চকচকে চোখ দুটোয় শাসানি। পুলিসের কর্তাটা চটপট পিছিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল।

*

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ফিরলেন তিন দিন পরে।

বাড়ির সবাই স্টেশনে গেলেন তাঁকে নিয়ে আসবার জন্যে। তিনি যে জন্যে গিয়েছিলেন সে কাজ হল কিনা — এ কথাটা ছিল সবারই মনে, কিন্তু কেউ সে কথা তুললেন না। তিনিও কিছু বললেন না। কিন্তু বাড়ি এসেই, তিনি পার্স্‌ থেকে সরকারী সীল-মোহর করা একখানা কাগজ বের করে ভ্লাদিমির ইলিচের হাতে দিয়ে বললেন:

'তোমার জন্যে এই উপহার এনেছি।'

'ও মামণি,' ভ্লাদিমির ইলিচ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এ যে আমার কী উপহার তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না!'

ভ্লাদিমির ইলিচ আর তাঁর মা উফা যাবার আগের দিন বিকেলে সবাই মিলে নৌকো করে বেড়াতে যাওয়া ঠিক হল। উইলোগাছটার তলে ছোট সুন্দর ফাঁকা জায়গায় বনভোজন হল, গান হল, আর খেলা হল কানামাছি। ছায়া ঘেরা একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ছেলেমেয়েদের এই আমোদপ্রমোদ দেখছিলেন।

সন্ধ্যার দিকে ওঁরা সবাই বাড়ি ফিরবার জন্যে বেরলেন। সবাই খুশি, সবাই আরও তাজা, তাঁদের হাতে হাতে বুনো ফুলের তোড়া। পাথরা নদীর খাড়া পাড় বেয়ে সবাই উপরে উঠলেন। নদীর উপর উঠছিল নীল কুয়াশার জাল। সূর্য অস্ত গেল। আঁধার ঘনিয়ে আসছিল। সদ্য কাটা ঘাসের গন্ধে ভরা বাতাস। কিচমিচ করা ফড়িঙের গান উঠছিল যেন ধুয়ো ধরে। শান্ত জলে একটা মাছ লাফাল, কোথায় একটা ব্যাঙ ডাকল, কাছেই ঝোপ থেকে কয়েক বার গেয়ে উঠল একটা বুলবুল। হাড্ডিসার ঘোড়ার একটা পাল নিয়ে যাচ্ছিল একদল ঘোড়সওয়ার ছেলে — তারা ছোট্ট উপত্যকাটার পিছনে মিলিয়ে গেল। আবার ফড়িঙের কিচিরমিচিরে ভরে উঠল নৈঃশব্দ। প্রথম প্রথম তারা ফুটল আকাশে। ৬৯

বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে নেই কারও। একটা খড়ের গাদার কাছে বসলেন সবাই। ভ্লাদিমির ইলিচ খড়ের গাদায় হেলান দিয়ে বসে মিষ্টি হাওয়ায় গভীর নিশ্বাস নিয়ে রোদ-পোহানো মাটির উষ্ণতা অনুভব করছিলেন। পরদিন সবাই যাবে ভিন্নভিন্ন দিকে। শেস্তের্নিন দম্পতি ফিরে যাবেন তাম্বভে; লেপেশিন্স্কি যাবেন প্স্কভে। ভ্লাদিমির ইলিচ, তাঁর মা আর বোন আন্না ইলিনিচ্না যাবেন ভলগা নদী দিয়ে। লেভিৎস্কি এখন শুধু ডাক্তার নন, তিনি 'ইস্ক্রা'র সংবাদদাতা হয়েছেন; কাগজ বিলি করবেন বলে ভার নিয়েছেন মারিয়া ইলিনিচ্না আর দ্মিত্রি ইলিচ। চুপচাপ বসে বসে তাঁরা ভাবছিলেন সামনে কঠিন কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর পথের কথা — এই পথে চলেছেন রাশিয়ার কত যে সৎ নরনারী!

'একটা গান গাওয়া যাক,' বললেন ভ্লাদিমির ইলিচ, 'আমাদের সবার প্রিয় গানটা।'

লেনিন গান ধরলেন:

> মাথার উপর ঝড় বাদলের শাসানি,
> আমাদের উপর অশুভ শক্তির পীড়ন...

খাটো গলায় তাঁর সঙ্গীরাও গলা মেলালেন:

> দুশমনের সাথে জীবন পণ লড়াই —
> অজানা অদৃষ্ট সামনে আমাদের...

নদীর ওপার থেকে ভেসে এল ধোঁয়া আর তাতে আলু পোড়াবার গন্ধ। ছোট উপত্যকাটায় ছেলেরা আগুন জেবলেছে এবং তাতে তারা আলু পোড়াচ্ছে। কাছেই জবলে উঠল আর একটা আগুন। আগুনের শিখার পটভূমিতে ছেলেদের ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছিল।

'আগুনগুলোর দিকে চেয়ে দেখো!' ভাবতে ভাবতে বললেন ভ্লাদিমির ইলিচ, 'আমরাও রাশিয়ার সব জায়গায় অগ্নিকুণ্ড সাজাব। আমাদের 'ইস্ক্রা' জ্বালিয়ে দেবে সেই অগ্নিশিখা।'

লেপেশিন্স্কি বললেন:

'কে জানে, একদিন হয়ত ঐ ছেলেরাই জ্বালবে বিপ্লবের আগুন!'

ছেলেরা শুকনো কাঠ গাদা করে দিল আর আগুনের শিখাগুলো আরও আরও উঁচু হয়ে লকলকিয়ে উঠল। তারা আগুনটাকে খুঁচিয়ে দিতেই অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ যেন তারা হয়ে লাফিয়ে উঠল।

অদৃশ্য ফড়িংগুলো ঘাসের ভিতর থেকে ঝিঁঝিঁ করে চলল। মাথার উপর মশার গুনগুনানি বলল পরদিনটা হবে খাসা।

জ. ভস্ক্রেসেনস্কায়া

আঁধার রাতে

১৯০৭ সালে ফিনল্যাণ্ডের একটা ঘটনা।

ডিসেম্বর মাস — কিন্তু আবহাওয়া যা উষ্ণ তেমনটা এ সময়ে সচরাচর হয় না। দক্ষিণ পশ্চিমী হাওয়ায় বটানি উপসাগরে পাতলা বরফ ভেঙে দিচ্ছিল। বরফে মোড়া হাজার হাজার ছোট্ট দ্বীপ আর উপদ্বীপগুলোকে দেখায় জমাট বাঁধা ঢেউয়ের মতো।

আবো শহর থেকে দ্বীপগুলোর উপর দিয়ে পথ ধরে যাচ্ছিল এক ঘোড়ায় টানা একখানা স্লেজগাড়ি। গাড়ি চালাচ্ছিলেন একজন ফিন্ — তাঁর নাম ভিক্তর কার্ল্সন। সওয়ারীটিকে নিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন লিল্মেইলো দ্বীপে। তিনি শুনেছিলেন যে, এই সওয়ারীটি রাশিয়ার জারের শত্রু — তিনি রাশিয়ার পুলিসকে এড়িয়ে আত্মগোপন করে ছিলেন। সওয়ারীটি সম্বন্ধে কার্ল্সন আর কিছুই জানতেন না।

এই সওয়ারী ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।

লেনিনকে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করবার জন্যে রাশিয়ার পুলিসের উপর হুকুম হয়েছিল। তাই তাঁকে চটপট দেশ ছেড়ে যেতে হয়েছিল।

সূর্য প্রায় অস্ত যায় — তখন তাঁরা পেঁছলেন একটা উঁচু ঢিবির উপর একটা লাল বাড়িতে; সেখানে ঐ একটামাত্র বাড়ি।

'এসে গেছি,' গম্ভীরভাবে বললেন কার্ল্সন।

কার্ল্সন গাড়ি থেকে নেমে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে পায়ের ধাক্কা দিয়ে দরজা খুললেন।

ছোট একটা কামরা, রান্নাও হয় সেখানে; কামরাটার কোথাও একটুও ময়লা নেই। মেঝেয় ছোট ছোট পাপোশ বিছানো, কাঠের দেওয়ালগুলোয় ঘরে-তৈরি গালিচা লাগানো। বড় ইটের উনুনটার পাশে তাকে এক সারি ঝকঝকে তামার পাত্র। উনুন থেকে উল্টো দিকের দেওয়াল অবধি সরু সরু কাঠি ঝুলানো আছে ছাদের বরগা থেকে। ঐ কাঠিতে গোল গোল রুটি।

কার্ল্সন দেউড়িতে দাঁড়িয়ে বাড়ির মালিক বের্গ্মানের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বললেন। তারপর সওয়ারীর কাছে বিদায় নিয়ে, বাড়ির কর্ত্রীর উদ্দেশে মাথা নেড়ে চটপট বেরিয়ে পড়লেন।

ভ্লাদিমির ইলিচ চওড়া বেঞ্চিখানায় গৃহকর্তার পাশে বসে তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন:

'শুনুন ভাই, আমার খুব তাড়াতাড়ি স্টকহোম যাওয়া দরকার। কিভাবে যাওয়া যায়?'

এই মৎস্যজীবী তাঁর বাদামী রঙের গেঁটে আঙুল দিয়ে পাইপে তামাক পুরছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন না: পাইপে তামাক পোরা আর কথা বলা — এই দুটো কাজ তিনি একসঙ্গে করতে

পারেন না। পাইপ ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে তিনি ধীরেসুস্থে তাকালেন আগন্তুকের দিকে — তিনি যেন বুঝে নিচ্ছিলেন আগন্তুকের তাকত কত। শেষে তিনি বললেন:

'যাওয়া সম্ভব নয়। কোন রাস্তা নেই। হেঁটে হোক, নৌকো করে হোক, — যাওয়া সম্ভব নয়। বরফ বেশ মজবুত হয়ে ওঠা অবধি অপেক্ষা করতে হবে।'

ভ্লাদিমির ইলিচ চট করে বললেন:

'আপনি বললেন হেঁটেও না, নৌকো করেও না, কিন্তু আমি যদি হেঁটেও যাই, নৌকো করেও যাই? বরফের উপর দিয়ে চ'লে নৌকোখানাকে সামনে ঠেলে নিয়ে যেতে পারি।'

মৎস্যজীবী আবার বললেন:

'তা হতে পারে না। বরফে মানুষের ভার সইবে না। আর ঐ বরফ কেটে নৌকোও চলতে পারে না।'

পরদিন সকালে বাড়ির কর্তার সঙ্গে উঠে ভ্লাদিমির ইলিচ হাত মুখ ধোবার পরে জানালার কাছে টেবিলখানায় বসে নোটবইখানা খুললেন।

ছোট জানালা দিয়ে তিনি গ্র্যানিটের ছোট্ট আর নিচু দ্বীপগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন; তাতে গাছপালা কম। গাছগুলো ঐ পাথরে শিকড় বসাল — সে কোন শক্তি দিয়ে? হয়ত মাটি ভরা ফাটলে বীজ পড়েছিল, তখন তার শিকড় পেয়েছিল অন্যান্য ফাটল, সেইসব শিকড় গ্র্যানিট কামড়ে ধরে গাছের শক্তি যুগিয়েছে। এখন আর কোন ঝড়ে ঐ গাছ পড়বে না।

রান্নাঘর থেকে বের্গমান শোবার ঘরের আধ-খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। তিনি কার্ল্সনের কথাটা ভাবছিলেন: 'এই মানুষটি যথার্থই জারের সবচেয়ে বড় শত্রু? দেখতে তো নিতান্তই সাধারণ মানুষ। টেবিলে বসেছেন — ওঁর বাঁ কাঁধের চেয়ে ডান কাঁধটা একটু উঁচু হয়ে উঠেছে, আর মাথাটা এক দিকে হেলানো, লিখেই চলেছেন, বাতাসের সাঁইসাঁই কিংবা ঢেউয়ের গর্জনের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই! এবার নকশাটা পড়ে দেখলেন, তারপরে বগলের নিচে চেপে হাত দুখানা একটু গরম করে নিয়ে আবার লিখতে আরম্ভ করলেন।'

সকালের খাবার তৈরি। মৎস্যজীবীর স্ত্রী টেবিলে এনে রাখলেন একটা তামার কফি-পাত্র, আর একখানা কাঠি থেকে কয়েকটা গোল রুটি। মৎস্যজীবী জানালেন:

'খাবার দেওয়া হয়েছে।'

খুশির হাসি মুখে ভ্লাদিমির ইলিচ রান্নাঘরে এলেন। খেতে বসে তিনি নানা বিষয় জানতে চাইলেন: মৎস্যজীবীর জীবনযাত্রা কেমন, পাথরে ফসল ফলানো হয় কিভাবে, কী ফসল ফলে, কত মাছ ধরা হয়, ইত্যাদি। মৎস্যজীবীর চুপচাপ স্ত্রীকেও তিনি কথাবার্তায় যোগ দেওয়ালেন।

*

ভ্লাদিমির ইলিচ বের্গ্মানের বাড়িতে ছিলেন কয়েক দিন। যাবার জন্যে তিনি অস্থির হয়ে উঠছিলেন। অনেক দরকারী কাজ ছিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্টকহোমে যাবার দরকার ছিল, আর তারপরে সুইজারল্যাণ্ডে। আগামী বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্যে তিনি সেখান থেকে রাশিয়ার শ্রমিক আর বলশেভিক পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

আরও দু' দিন অপেক্ষা করতে হল — এ দুটো দিন যেন কিছুতেই শেষ হচ্ছিল না।

পরদিন সকালে তিনি রোজকার মতো জিজ্ঞাসা করলেন:

'বরফের অবস্থা কি?'

বের্গ্মান বললেন:

'এখনও যথেষ্ট মজবুত নয়। হাওয়া বদলায় নি। নতুন বছর পড়ার আগে এখান থেকে বেরতে পারবেন না। আসছে সপ্তাহে বড়দিনের পরব শুরু হচ্ছে। বড়দিনের সময়ে কেউ কোথাও যায় নাকি?'

'না,' ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন, 'বড়দিনের আগেই আমার স্টকহোমে যাওয়া চাই। কালই রওনা হতে হবে। কালই!'

বের্গ্মান কিছু বললেন না। তিনি নিজের কাজ নিয়েই থাকলেন।

কিন্তু দুপুরের খাবার পরে তিনি চালা থেকে চ্যাপটা খোলের একখানা ছোট নৌকো টেনে বের করে সেটাকে ঠিকঠাক করতে লেগে গেলেন। তিনি দাঁড় আটকাবার খাঁজের সামনে সোজা করে কয়েকটা ঠেকো লাগালেন পেরেক দিয়ে, আর সেগুলির উপর পেরেক ঠুকে আড়াআড়ি একটা ডান্ডা লাগিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যার দিকে তিনি বললেন যে, সব তৈরি হয়ে গেছে। বেরতে হবে ভোরের আগেই। অন্ধকার থাকতেই পথে গ্রামগুলো পার হয়ে যেতে হবে। বরফ কাটা জাহাজ যেখানে খোলা জল বের করে দিয়ে যাবে সেখানে ঠিক সময়ে পেঁছন চাই। ভ্লাদিমির ইলিচের চামড়ার বুটের দিকে তাকিয়ে তাঁর চাউনিতে বিরূপ ভাব ফুটে উঠল। দুপুরের খাবার পরে বেরিয়ে তিনি মৎস্যজীবীরা যেমন পরে তেমনি প্রকান্ড এক জোড়া বুট নিয়ে ফিরলেন।

...তখন ভোর হতে ঘণ্টা দুই বাকি। বের্গ্মানের স্ত্রী ওঁদের খেতে দিলেন ভাজা মাছ, রুটি আর কফি। ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে তাঁর আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ জানালেন।

*

সমুদ্র থেকে সিটি আর কুয়াশার জন্যে সাইরেনের হুঁশিয়ারি সংকেত হচ্ছিল বারবার। কুয়াশার ভিতর দিয়ে চাঁদ দেখা দিল। বটনি উপসাগরের কালো জলে পড়ল চাঁদের আলো।

দুজনে ডান্ডাটার এক এক প্রান্ত ধরে নৌকাখানাকে ঠেলে নিয়ে চললেন। বরফের অসম পিঠে নৌকো হড়হড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলল। জমাট বাঁধা বরফের ঢেলায় তাঁরা হোঁচট খেলেন। ভ্লাদিমির ইলিচ এক হাতে ধরে ছিলেন সেই আড়াআড়ি লাগানো ডান্ডাটা, আর অন্য হাতে লণ্ঠন।

বের্গ্মান একটা গুপ্ত আঁকাবাঁকা পথ ধরে ওঁকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথটা সম্ভবত কেবল তাঁরই জানা। প্রতি পঞ্চাশ ফুটের মতো চলবার পরে তিনি থেমে, নৌকো থেকে লগি নিয়ে ঘোঁতঘোঁত আওয়াজ করে, সেটাকে সামনে বরফের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখছিলেন বরফের স্তরটা কতটা পুরু।

উত্তরে হাওয়া বইছিল। ওঁদের হিম ধরা মুখে লাগছিল হাওয়ার ঝাপ্টা। লণ্ঠনের গায়ে দেখা যাচ্ছিল হাওয়ায় উড়ন্ত বরফের দমকা।

দু' কিলোমিটারও পথ চলা হয় নি, কিন্তু ওঁরা ক্লান্তি বোধ করছিলেন, আর গা দিয়ে ঘাম ঝরছিল।

মেঘলা ভোর ফুটছিল, কিন্তু সে ভোর অতি ক্ষীণ আর ধূসর — মনে হচ্ছিল যেন সে ভোর থেকে দিন আসবে না কখনও।

দ্বীপগুলোর মাঝে মাঝে বরফ জমাট জায়গাগুলো ক্রমেই বেশি প্রশস্ত হয়ে উঠতে থাকল। একটা দ্বীপের সামনে দেখা গেল বহু বিস্তৃত একটা জলভাগ। এবার এই প্রথম ওঁরা নৌকোয় চড়লেন। দাঁড় বেয়ে কয়েক ফুট গিয়ে ওঁরা পৌঁছলেন বরফের অন্য কিনারায়। তখন ওঁরা নৌকোখানাকে টেনে নিয়ে গেলেন দ্বীপের উপর দিয়ে। সামনে একটা প্রকাণ্ড বরফের স্তূপের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বের্গ্‌মান বললেন:

'এবার যেতে হবে ঐ দ্বীপটায়।'

ভ্লাদিমির ইলিচ হাত দিয়ে সেই আড়াআড়ি ডাণ্ডাটা ধরে ছিলেন — তাতে তাঁর বাহু মুচড়ে যাচ্ছিল। দূরে দৃষ্টি ফেলে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন বের্গ্‌মানের সঙ্গে সমান তালে চলবার জন্যে।

'কত দূর এলাম?'

বের্গ্‌মান একটু হেঁয়ালি করে বললেন:

'পথের সবচেয়ে বেশি অংশ আমরা পার হয়ে এসেছি, কিন্তু কঠিন অংশ এখনও সামনে।'

বরফে লগি ঢুকিয়ে দেখবার জন্যে তিনি এখন আরও ঘনঘন থামছিলেন। তখন তিনি ঘোঁতঘোঁত করে 'হো' করে উঠছিলেন — সেটাতে কখনও উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছিল, কখনও সেটাকে মনে হচ্ছিল প্রশ্নের মতো, আর সেটা গালির মতোও শোনাচ্ছিল কখনও কখনও।

একটা প্রকাণ্ড সমতল ভাসন্ত বরফরাশিতে ওঁরা পৌঁছলেন। ভ্লাদিমির ইলিচ একটু দম ফেলতে চাইছিলেন, আর আড়ষ্ট হাত পাগুলোকে একটু জিরিয়ে নিতে চাইছিলেন; কিন্তু এক পা ফেলতে না ফেলতেই ভাসন্ত বরফরাশিটা কাত হয়ে তাঁর বাঁ পাখানা ফসকে জলে পড়ে গেল।

তুষারের ভিতর দিয়ে মাথা তুলেছিল একটা বরফের চাঙড় — সেটার কিনারায় ডান পা ফেলবার চেষ্টায় তিনি ডাণ্ডাটাকে আঁকড়ে ধরলেন। সেখানে পা দেওয়া মাত্রই গোটা ঢিবিটা ডুবে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে ওঁর বুট জলে ভরে গেল। ডাণ্ডাটাও ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল।

ভীষণ আওয়াজ তুলে ভাসন্ত বরফরাশিগুলো সরে সরে যেতে থাকল। পায়ের তলা থেকে বরফ সরে যাচ্ছিল। বড় বিপদ!

ভ্লাদিমির ইলিচ তাকালেন বের্গ্‌মানের দিকে। বের্গ্‌মান তখন কোমর জলে — তাঁর মুখখানা কালো হয়ে গেছে, চোখ গোল গোল।

'নৌকোয় চাপুন! নৌকোয়!'

আড়াআড়ি লাগানো ডাণ্ডাটায় ভর করে ওঁরা দু'দিক থেকে নৌকো ধরলেন। ডাণ্ডাটা দুমড়ে

গিয়ে ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ উঠল। দাঁড় লাগাবার খাঁজে কষে চেপে ধরে ওঁরা একই সময়ে দু' দিক থেকে নৌকোয় ঠেলে উঠলেন।

ভ্লাদিমির ইলিচের হঠাৎ ভীষণ শীত লাগল। তাঁর দাঁতে-দাঁত ঠকঠক করছিল, তবু তিনি হঠাৎ হো-হো করে হেসে ফেলে বললেন:

'জলটাকে যেন একটু ঠাণ্ডাই মনে হচ্ছে!'

প্রকাণ্ড একখানা ফেল্ট্ কাপড় জড়ানো ছিল — সেটাকে বের্গ্‌মান খুলে ফেললেন। ভ্লাদিমির ইলিচের বুট বের করবার সময়ে তাঁর হাত কাঁপছিল। বুটজোড়া ছিল বেশ উষ্ণ — যেন উনুন থেকে বের করা হয়েছে তখনই। বের্গ্‌মানের স্ত্রী সেই বুটের মধ্যে এক জোড়া পশমের মোজাও সযত্নে গুঁজে দিয়েছিলেন। বের্গ্‌মান দেখলেন তাঁর সঙ্গী তাঁর দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ৭৫

বুটের ভিতর থেকে মোজা বের করতে করতে ভ্লাদিমির ইলিচ জিজ্ঞাসা করলেন বের্গ্‌মানেরও পা ভিজেছে কিনা। বের্গ্‌মান জানালেন তাঁর পা ভেজে নি। তাঁর পরনে ছিল ক্যাম্বিসের ওভারঅল্‌জ্ — তার সঙ্গে বুট জোড়া। ভ্লাদিমির ইলিচ মোজা আর বুট বদলে একটু উষ্ণতা আনবার জন্যে দু'বাহু জোরে জোরে নাড়াচাড়া করছিলেন।

বের্গ্‌মান ইতোমধ্যে ফেল্টের জড়ান খুলে একটা ফ্লাস্ক বের করলেন। সযত্নে মুচড়ে তিনি ফ্লাস্কের ঢাকনাটা খুললেন। কফি থেকে ধোঁয়া উঠছিল — তার গন্ধে ভরে উঠল বাতাস।

'আঃ, কী চমৎকার!' গরম কফিতে আস্তে চুমুক দিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ বলে উঠলেন।

দুজনে এক এক পেয়ালা কফি খাবার পরে ওঁরা আবার এগোলেন। বরফের অন্য কিনারায় পেঁছে ওঁরা নৌকো থেকে নেমে, নৌকো টেনে নিয়ে চললেন সেই বরফের উপর দিয়ে।

নাগু দ্বীপ তখন মাত্র আধ কিলোমিটার দূরে। বরফ কাটা জাহাজ সেখানে জলে পথ করে দিয়েছে। সেখানে গিয়ে সুইডেনের একখানা স্টীমারের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। সেই স্টীমারখানা আবো থেকে স্টকহোমে যায়।

চলার এই শেষ অংশটাই যেন সবচেয়ে কঠিন হল।

শেষে ওঁরা দেখলেন সেই খোলা জলভাগ। অনেক চেষ্টা করে তাঁরা সেখানে পেঁছলেন। এবার দুজনে নৌকোয় চেপে নিথর হয়ে বসে স্টীমারের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলেন।

আড়াআড়ি লাগানো ডাণ্ডাটা আর তার ঠেকোগুলোকে বের্গ্‌মান খুলে ফেললেন। এখন সেগুলো দিয়ে আর কোন দরকার নেই। সেখানে জানা এক মৎস্যজীবীর কাছে নৌকোখানা রেখে তিনি বাড়ি ফিরবেন স্টীমারে।

কুয়াশা কেটে যাচ্ছিল। বরফে ঢাকা সমভূমি আর ধূসর নয়। দিন ফুটছিল — তখন রঙ বদলে হয়েছে হরিতাভ নীল।

কখন স্টীমার আসবে সেটা লক্ষ্য করবার জন্যে দুজনেই নৌকোয় বসে তাকিয়ে রইলেন উত্তর-পূব দিকে।

দূরের দ্বীপটার ওধারে ধূসর ধোঁয়ার একটা চলন্ত রেখা দেখা গেল। এসে গেল! সংকীর্ণ জলভাগ দিয়ে আসবার সময়ে স্টীমারখানাকে প্রকাণ্ড মনে হচ্ছিল। ওঁরা দুজনে গলাবন্ধ নাড়তে থাকলেন। সেটা তাদের নজরে পড়ল।

স্টীমার থেকে নামিয়ে দেওয়া হল একখানা ডিঙি — তাতে একজন মাঝি।

ভ্লাদিমির ইলিচ বের্গ্‌মানের সঙ্গে করমর্দন করে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

বের্গ্‌মান আস্তে আস্তে বললেন:

'শুভ যাত্রা, শুভ যাত্রা!'

ন. খোদ্‌জা

পশ্চাদ্ধাবন

যত দূর মনে পড়ে তাতে এই কাহিনীর ঘটনাটা ১৯১৭ সালের জুন মাসের। তখন আমি ছিলাম সাঁজোয়াগাড়ি সৈন্যদলে ড্রাইভার।

এক রাত্রে আমি গাড়ি চালিয়ে গেলাম তাউরিদ প্রাসাদে। সেখানে আমাদের সৈনিক প্রতিনিধিদের সভা হচ্ছিল। আমি গাড়ির মোটর বন্ধ করে অপেক্ষা করছিলাম: কয়েকজন প্রতিনিধিকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেবার কাজ পড়েছিল আমার উপর।

সভা শেষ হলে আমাদের ডিভিশন কমিটির সভাপতি ছুটে এসে আমাকে বললেন:

'তোমাকে একটা পার্টির কাজ দিচ্ছি। এখন বাজে বারটা। দশ মিনিটের মধ্যে আমি একজন কমরেডকে নিয়ে আসব। তিনি যেখানে বলেন সেখানে তাঁকে নিয়ে যাবে। বুঝলে তো?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি। তাঁর নাম কি?'

আমার প্রশ্ন শুনে সভাপতি খুব চটে গিয়ে গলা চড়িয়ে বললেন:

'তা দিয়ে তোমার দরকার কি? এটা পার্টির নির্দেশ — তুমি নির্দেশটা পালন করবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা: এই কমরেডের যদি কিছু ঘটে তাহলে তোমাকে বোধহয় সেণ্ট আইজাক ক্যাথিড্রালে যেতে হবে।'

'কিসের জন্যে?'

'তোমার নিজের অন্ত্যেষ্টির জন্যে! বুঝলে তো কিসের জন্যে!' এই বলে তিনি চলে গেলেন।

ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছিল। আমি তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলাম। একটু পরেই মাথায় ক্যাপ, বেসামরিক পোশাক-পরা একজনকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সভাপতি ফিরে এলেন। তাঁরা বেশ কাছে এসে গেলে চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেয়ে আমার তো হাঁফ ধরে গেল। লেনিন! অল্প কিছু দিন আগেই আমি তাঁকে দেখেছিলাম, তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলাম — তাঁর মুখখানা আমার মনে ছিল।

লেনিন গাড়িতে উঠে বললেন যেতে হবে প্রথমে ময়কায়, তারপরে লিগোভকায়। যত জোরে পারি গাড়ি চালাতে বললেন।

ময়কার দিকে চললাম। সেখানে বলশেভিক সংবাদপত্র 'প্রাভদা'র সম্পাদকীয় দপ্তর।

লেনিন সেখানে ছিলেন অল্প কয়েক মিনিট। তারপরে শহর পাড়ি দিয়ে চললাম লিগোভকায়।

গাড়ি চালাতে চালাতে আমার লেনিনকে আর একবার দেখতে ইচ্ছে হল। তাঁকে দেখবার জন্যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ফাঁকা রাস্তা ধরে একখানা মোটরগাড়ি আমাদের পিছু নিয়েছে। গাড়িখানার হেডলাইট নেবানো, মোড় ঘুরবার সময়ে কেন ইঙ্গিত করছিল না। আমি বারবার ডাইনে বাঁয়ে ঘুরলাম, কিন্তু লেজটাকে খসাতে পারলাম না। ঐ গাড়িতে কে আছে দেখবার জন্যে

বছরের পর বছর কাটত তখন ভ্লাদিমির তাঁর পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে দেখা করতে পারতেন না। তাঁর মা আর দিদি এই ছবিখানা তুলে পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে।



অস্থায়ী সরকারের স্পাইগুলো লেনিনকে খুঁজছিল। অজ্ঞাত-বাসে থাকবার সময়ে লেনিন 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বইখানা লিখে চলেছিলেন।



ক্রুজার 'অরোরা': এই জাহাজের কামান গর্জন
হয়েছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংকেত।



বুর্জোয়া সরকারের সময় ফুরিয়ে এল।
অক্টোবরের অভ্যুত্থান।



আমি গাড়ির গতি একটু কমিয়ে দিলাম। সেই গাড়ির ড্রাইভার ছিল একজন য়ুঙ্কার, আর সওয়ারীরা সব শ্বেতরক্ষী অফিসার।

লেনিন আমাকে ঘাড় ফেরাতে দেখে বললেন:

‘কিছু বলতে চাইছিলেন, কমরেড?’

‘আমাদের পিছনে ফিরে চেয়ে দেখুন, কমরেড লেনিন।’

লেনিন পিছনে তাকিয়ে বললেন:

‘আমি তো দেখতে পাচ্ছি শুধু একখানা গাড়ি।’

‘ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে। আমার মনে হয় ওরা কেরেনস্কির সদরঘাঁটির লোক।’

লেনিন বললেন:

‘আপনি নিশ্চয়ই লেজটাকে খসিয়ে দিতে পারবেন।’

আমি গ্যাস চড়িয়ে দিলাম। তখন ভাবছিলাম—আহা, গাড়িখানা যদি উড়তে পারত। ভাবলাম, ‘ব্রেক নিশ্চয়ই ঠিক ধরতে পারবে—নইলে তো প্রথম মোড় ঘুরতে গিয়েই ভেঙ্গে চৌচির!’ চিন্তাটা মোটেই প্রীতিকর নয়, কেননা, আমার সওয়ারী আর কেউ নন — লেনিন।

পিছনে তাকাতে আর সাহস হচ্ছিল না। তখন যত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলাম তাতে সামনের রাস্তা থেকে চোখ সরানো চলে না। তখন ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন:

‘ওরা পিছনে পড়ে যায় নি। আরও জোরে চালাতে পারেন? চেষ্টা করে দেখুন।’

গ্যাসের পেড্যাল একবারে শোয়ানো ছিল। আমার আর পিছনে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না। তবে, আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, প্রাণপণ চেষ্টা করেও ওরা আমাদের নাগাল ধরতে পারবে না।

ততক্ষণে আমরা লিগোভকার কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। ঘুরে পরের রাস্তায় পড়ে দেখতে পেলাম ফুটপাথের কাছে একটা প্রকাণ্ড গর্ত। একটা নড়বড়ে বেড়া দিয়ে গর্তটা ঘেরা, আর হুঁশিয়ারি হিশেবে সেই বেড়া থেকে ঝুলানো একটা লাল লণ্ঠন।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। গাড়ি থামিয়ে, লাফিয়ে পড়ে, আমি লণ্ঠনটা নিবিয়ে দিয়ে লাথি মেরে বেড়াটাকে ভেঙে দিলাম। আবার লাফিয়ে গাড়িতে চড়ে সতর্কভাবে গর্তটার পাশ কাটিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেলাম। তখন গাড়ি আর খুব জোরে চালানো যাচ্ছিল না। রাস্তার প্রায় মাথায় পৌঁছে পিছনে একটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পেলাম। যারা আমাদের পিছু নিয়েছিল তারা পুরো বেগে পড়েছিল সেই গর্তে।

হৈ-চৈ লেগে গেল, পুলিসের বাঁশি বাজতে থাকল কর্কশ সুরে — সব মিলিয়ে সে এক হুলস্থুল ব্যাপার।

স্বভাবতই, ঐসব গোলমালে কান দেবার কোন অভিপ্রায় আমাদের ছিল না। পুরো বেগে গাড়ি চালিয়ে দিলাম লিগোভকার দিকে। তখন আমি পিছনে তাকিয়ে লেনিনকে দেখতে পারি। যখন তাকালাম দেখলাম তিনি হাসছেন। হাসবার মতোই কিছু বটে — আমিও হাসলাম তাঁর সঙ্গে।

আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছিলাম ঠিক সময়ে এবং খুব খোশমেজাজে।

প. কাপিৎসা

শহরে

('কমরেড ইভানভ' গল্প থেকে)

১৯১৭ সালের ২৪এ অক্টোবর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিন ভ্লাদিমির ইলিচের মন খুব বিচলিত ছিল। বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ তাঁর জানা ছিল, কোথায় কত শক্তি সমাবেশ হল তাও তাঁর জানা ছিল, তবু তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে আসন্ন ঘটনার জন্যে চুপচাপ বসে থাকতে পারছিলেন না। 'আমাদের কমরেডরা স্থিরনিশ্চিত হয়ে কাজ করছেন তো?' যা ঘটছিল সেই সবকিছু সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিফহাল থাকতে চাইছিলেন।

সকালের মধ্যেই কয়েক বার তিনি মার্গারিতা ভাসিলিয়েভনা ফফানোভাকে ভিবর্গ জেলা পার্টি কমিটির দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন। রাস্তায় রাস্তায় কী চলছে তার উপর নজর রাখবার জন্যে এবং সম্ভব হলে ঘটনার ধারা বুঝে আসবার জন্যে ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁকে বলেছিলেন।

ভ্লাদিমির ইলিচকে কি বলতে পারেন তিনি? মঙ্গলবার সব সময়েই খুবই মামুলী দিন। আপিস-কাছারি, কল-কারখানা, দোকানপাট, সিনেমা সব খোলা — যথারীতি সব কাজ চলছে। তবে, রাস্তায় ট্রাম গাড়ি বোধহয় কিছু কম, আর সামরিক উর্দি-পরা লোক সচরাচর যা থাকে তার চেয়ে বেশি।

বিকেলের দিকে শোনা গেল নিকোলায়েভস্কি পুল তুলে নেওয়া হয়েছে। ফফানোভার কাজ ছিল ভাসিলিয়েভস্কি দ্বীপে — তাই, ভিবর্গ পাড়ায় যেতে তাঁকে গ্রেনাদেরস্কি পুল দিয়ে অনেকটা ঘুরে যেতে হল। অন্য সমস্ত রাস্তা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল।

মাঝিরা তাদের ছোট ছোট নৌকো করে সওয়ারীদের নেভা নদীতে খেয়া পারাপার করছিল।

ছদ্মবেশের একটা অংশ পরচুলাটাকে তিনি খুলে ফেললেন। পিছনে হাতে হাত ধরে ভ্লাদিমির ইলিচ হলঘরে পায়চারি করছিলেন।

বাড়িওয়ালী ফিরলে ভ্লাদিমির ইলিচ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন:

'শহরে কী ঘটেছে? সব কেমন চলছে?' কিন্তু মার্গারিতা ভাসিলিয়েভনার কথা থেকে বিশেষ কিছু জানা গেল না। রাস্তায় রাস্তায় তিনি সশস্ত্র লোকজন দেখেছেন, কিন্তু নেভা নদীর পুলগুলো তোলা হয়েছে কেন সেটা তাঁকে কেউ বলতে পারল না।

তাঁকে ওভারকোট না-ছাড়তে অনুরোধ জানিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন:

'জেলা কমিটিতে একটা চিঠা পাঠাতে চাইছি।'

এই চিঠি লেখা হয়েছিল কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে।

ভিবর্গ জেলা কমিটির দপ্তর যেসব কমরেডের জিম্মায় ছিল তাঁদের হাতে ফফানোভা সেই চিঠিখানা দিলেন। তাঁরা নিশ্চয়ই স্মল্‌নিতে ফোন করেছিলেন: তাঁরা ফফানোভাকে বললেন

তিনি যেন লেনিনকে বলেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁকে নিজের ফ্ল্যাট থেকে বেরবার অনুমতি দিচ্ছে না।

'তাহলে আমাকে বেরতে দেবে না?' ফফানোভার কাছে সব শুনে ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন, 'তারা আমার নিরাপত্তার জন্যে উদ্বেগ বোধ করছে। কিন্তু, কমরেড, আমি মানতে পারছি নে। বুঝিয়েশুঝিয়ে আমি তাদের মত বদলে নেবো।'

ভ্লাদিমির ইলিচ খুব তাড়াতাড়ি আর একখানা চিঠা লিখলেন। এই চিঠায় নিশ্চয়ই কড়া কড়া কথা ছিল: ফফানোভা জেলা কমিটির সম্পাদকের হাতে চিঠিখানা দিলে, যেখানে কমিটির সভা হচ্ছিল সেখান থেকে বেগে বেরিয়ে এলেন নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন:

'ভ্লাদিমির ইলিচ কি খুব রেগে গেছেন?'

'হ্যাঁ, খুবই।'

'তবু, কমরেড, তাঁকে গিয়ে বলুন যে, তাঁকে বাড়িতেই থাকতে হবে। তাঁকে পরে জানানো হবে।'

মার্গারিতা ভাসিলিয়েভনা বাড়ি ফিরে ভ্লাদিমির ইলিচকে সব বললেন। তিনি যে কত অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন সেটা উনি বুঝতে পারছিলেন।

'আপনাকে আমার আবার যেতে বলতে হচ্ছে,' ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন, 'আমি আর দেরি করতে পারছি নে। সবকিছু নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

ফফানোভা বললেন:

'বেশ, ঠিক আছে, কিন্তু একটা শর্ত আছে: বসুন, আগে খেয়ে নিন, খাসা খাবার তৈরি করেছি আমি, কিন্তু আপনি সেটা পরখ করেও দেখলেন না...'

ভ্লাদিমির ইলিচ একটু হাসলেন।

'বেশ, ডীনার খাবো। কিন্তু আপনাকে আবার কমিটির দপ্তরে যেতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে আরও একখানা চিঠা পাঠাবো।'

তিনি নিজের কামরায় ঢুকলেন, আর মার্গারিতা ভাসিলিয়েভনা চলে গেলেন রান্নাঘরে।

লেনিন খুব তাড়াতাড়ি লিখলেন: 'কমরেডসব, এটা আমি লিখছি ২৪এ সন্ধ্যায়। পরিস্থিতি চূড়ান্ত মাত্রায় সঙ্গিন। প্রকৃতপক্ষে এখন সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, অভ্যুত্থানে বিলম্ব ঘটলে সেটা হবে মারাত্মক।'

কাগজখানা ভাঁজ করে তিনি রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন।

'এই নিন। ফিরবেন যত শিগগির সম্ভব। যদি এগারটার মধ্যে না ফেরেন, তাহলে আমি যা ভাল মনে করব তাইই করব।'

ফফানোভা আবার বেরলেন। বেশ কিছু সময় কেটে গেল—তিনি ফিরলেন না। একটু পরেই দরজায় কে টোকা দিল। এলেন এইনো রাহিয়া। তাঁকে দেখে ভ্লাদিমির ইলিচ খুব খুশি হলেন। রাহিয়াকে নিজের সঙ্গে খেতে বলে উনি তাঁকে শহরের খবরাখবরের জন্যে প্রশ্ন করতে থাকলেন।

কিন্তু রাহিয়া বিশেষ কিছু জানাতে পারলেন না — কেননা, তিনি সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটির সদস্য ছিলেন না। বিপ্লবের সদরঘাঁটি স্মল্‌নিতে যাঁরা রয়েছেন কেবল সেই কমরেডরাই সবকিছু সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল।

রাহিয়ার কাছে স্মল্‌নিতে ঢুকবার পাস ছিল দু'খানা, কিন্তু স্মল্‌নিতে যাবার উপায় কি? তখন অত রাত্রে ট্রামগাড়ি চলছিল না। অত পথ হেঁটে যাওয়াও যায় না: ভ্লাদিমির ইলিচের ফ্ল্যাট থেকে অন্তত দশ মাইল।

ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন:

'কিছু ভাববেন না। একটা কিছু উপায় হবেই।' ফফানোভার কাছে একখানা চিঠা লিখে রেখে তিনি জামাকাপড় পরতে আরম্ভ করলেন। বিনা ছদ্মবেশে তাঁর ফ্ল্যাট থেকে বেরন খুবই বিপজ্জনক। কাজেই, তিনি একটা পরচুলা আর চশমা পরে নিলেন, আর দাঁতে ব্যথা হলে লোকে যেমন করে সেইভাবে চোয়াল ঢেকে একখানা রুমাল বেঁধে একটা পুরন দুমড়ানো টুপি পরে সেটা চোখের উপর নামিয়ে দিলেন। ৮৫

'ঢের ছদ্মবেশ হয়েছে,' এই বলে তিনি রাহিয়াকে বললেন, 'চলুন। আলোটা নিবিয়ে দিন।'

রাহিয়া আলো নেবালেন। দু'জনে নামলেন নিচে।

রাস্তা ফাঁকা। শেষের একখানা ট্রামগাড়ি দেরিতে ডিপোয় ফিরছিল। ভ্লাদিমির ইলিচ ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঠিক সময়মতো লাফিয়ে উঠলেন পাদানিতে। রাহিয়াও উঠলেন পিছু পিছু।

সওয়ারী ছিল না আর কেউ। মেয়ে কন্ডাক্টরটির উল্টো দিকে একটা আসনে বসে ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর কাছে জানতে চাইলেন ট্রামখানা কোথায় যাবে। কন্ডাক্টরটি একটু অস্থির হয়ে বাইরে অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়েই রইলেন।

'ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন না,' রাহিয়া বললেন ফিসফিসিয়ে, 'আপনার গলার স্বর চিনে ফেলতে পারে — হয়ত কখনও আপনার বক্তৃতা শুনেছে।'

ভ্লাদিমির ইলিচ তবু জিদ ধরে জিজ্ঞাসা করলেন: 'গাড়ি কি ডিপোয় যাচ্ছে?'

কন্ডাক্টর যেন তাঁর প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে বললেন:

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'তাতে আপনার কি? আর, আপনি কেই বা বটেন?'

'একজন মজুর।'

ওঁর দিকে এক নজর তাকিয়ে কন্ডাক্টর বললেন:

'মজুর, না আরও কিছু!' তিনি ভেঙিয়ে কথাদুটো উচ্চারণ করলেন — 'কোথায়? কেন?' তারপরে তিনি বললেন, 'জানেন না কি কী চলছে? আমরা যাচ্ছি বুর্জোয়াদের সঙ্গে লড়তে — শুনলেন তো কোথায়?'

তাঁর উত্তর শুনে ভ্লাদিমির ইলিচ বড় খুশি হলেন।

*

শেষের স্টপে ট্রাম থেকে নেমে ওঁরা চললেন ফাঁকা রাস্তা ধরে। সমস্ত বাড়ির ফটক তালা-বন্ধ। রাস্তা জনমানবশূন্য। ওঁরা মনে করলেন আর কোন বিপদ নেই — এবার নিরাপদে স্মল্‌নিতে পৌঁছন যাবে। হঠাৎ একটা মোড় থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চলল দু'জন ঘোড়সওয়ার। তারা বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে কথা বলতে থাকল। তারা গোলন্দাজ বিদ্যালয়ের দুজন ক্যাডেট।

রাহিয়া ফিসফিসিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচকে বললেন:

'চটপট এগিয়ে যান। আমি ওদের আটকাবো।'

ইতোমধ্যে ক্যাডেট দুজন ঘুরে রাহিয়ার দিকে এগোল।

'পাস!'

'কিশ্যের পাশ্‌শ্‌?' রাহিয়া মাতালের ঢঙে বললেন।

ভ্লাদিমির ইলিচ ততক্ষণে রাস্তাটার অন্য দিকে নজরের বাইরে চলে যাচ্ছিলেন।

'পাস দেখাও — নইলে...' এই বলে ক্যাডেটটা চাবুক উঁচিয়ে ধরল।

'তুমি কে হে?' এই বলে চেঁচিয়ে উঠে রাহিয়া টলতে থাকলেন। তিনি পকেটে হাত ঢুকিয়ে পিস্তলটায় আঙুল বসালেন ঠিক জায়গামতো। তার পরে তিনি ঘোড়াটার দিকে এক পা এগোলে সেটা নাক ফোঁসফোঁস করে পিছিয়ে গেল।

অন্য ঘোড়সওয়ার ভয়ে ভয়ে বলল:

'আরে, মাতালকে যেতে দাও!'

'জাহান্নমে যাক! চলো, চলো!' এই বলে ক্যাডেটটা হাওয়ায় চাবুক কষিয়ে দুজনে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল লিতেইনি প্রসপেক্ট-এর দিকে।

একটু পরেই স্মল্‌নি দেখা গেল। আগে ছিল অভিজাতদের মেয়েদের ইস্কুল বাড়ি — এই দীর্ঘ ইমারতটায় তখন প্রত্যেকটা আলো জ্বলছিল। গাছগুলোর তলায় দাঁড়িয়ে ছিল সব সাঁজোয়াগাড়ি। এখানে-ওখানে উৎসবাগ্নি জ্বলছিল দাউদাউ করে। বোঝা যায় সদরঘাঁটি খুবই কর্মব্যস্ত।

দেশের সমস্ত জায়গা থেকে এসেছেন দ্বিতীয় সারা রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। সদর ফটকের কাছে তাঁদের ভিড় জমেছে। মেনশেভিকরা ম্যান্ডেট কমিটিটাকে হাত করেছিল। তারা শেষ মুহূর্তে পাস-এর রঙ বদলে নিজেদের সমর্থকদের দিয়েছিল লাল পাস্‌, অথচ অন্যান্য সবার পাস ছিল শাদা। সান্ত্রীদের তারা বলে দিয়েছিল যে, লাল পাস্‌ ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেবে না। তাই অত প্রতিনিধি বাইরে পড়ে গেছেন।

ফটকে সমবেত সবাই রেগে চিৎকার করছিল। একজন শ্রমিক তাঁর শাদা পাস্‌খানা নেড়ে নেড়ে সান্ত্রীর কাছে কৈফিয়ত চাইছিলেন: 'ঢুকতে দেবে না — তার মানে? আমি প্রতিনিধি! আমাকে ঢুকতে না দেবার কোন এক্তিয়ার তোমার নেই!'

শ্রমিক প্রতিনিধিটি সচকিত সান্ত্রীদের উপর চেপে এগিয়ে গেলেন। কাছাকাছি যারা ছিল তারা চিৎকার করছিল:

'কী হচ্ছে সব! তোমরাই সব জগাখিচুড়ি পাকিয়ে এখন আমাদের ঢুকতে দিচ্ছ না। চলো — সবাই! এগিয়ে চলো!'

সবাই মিলে জোর করে দালানে ঢুকে পড়ল। ভ্লাদিমির ইলিচও সেই ভিড়ের মধ্যে পড়ে ভিতরে চলে গেলেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে তিনি মৃদু হেসে বললেন:

'আমাদের পক্ষ জিতবে সব সময়েই!'

তিনি তিন-তলায় উঠে সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটির দপ্তরে ঢুকলেন। সেখানে কমরেডরা জানালেন যে, বিপ্লবী গ্রুপগুলি ঠিক পরিকল্পনা অনুসারেই এগচ্ছে।

সে রাত্রে লাল রক্ষীরা শহরে মূল মূল কেন্দ্রগুলো হাতে নিল: রেলস্টেশনগুলো, ব্যাঙ্কগুলো, পুলগুলো, টেলিফোন আর টেলিগ্রাফ আপিস। বার্তাবহরা আসতে থাকল স্মলনিতে। তারা সব আসতে থাকল নতুন নতুন সুসংবাদ নিয়ে: অন্যান্য পুলও দখলে, খেয়া পারাপার চালু করা হয়েছে, অস্থায়ী সরকারের শেষ আস্তানা — শীত প্রাসাদের দিকে ফৌজ এগচ্ছে।

ভোর নাগাদ গোটা নগরী বিদ্রোহীদের হাতে এসে গেল। তখন অস্থায়ী সরকারের হাতে বাকি রইল শুধু শীত প্রাসাদের সামনে প্রাঙ্গণটা আর তার লাগাও কয়েকটা রাস্তা।

ভ্লাদিমির ইলিচ প্রায় সারা রাত জেগে কাজ করলেন। সকাল নাগাদ তিনি একটা 'আবেদন' লেখা শেষ করলেন: 'রাশিয়ার নাগরিকদের কাছে আবেদন'।

পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থান জয়যুক্ত হল। তখন সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটির হাতে সমস্ত ক্ষমতা।

ইতিহাসে এই প্রথম বিদ্রোহীরা রেডিও সম্প্রচার-ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারল। সমস্ত জাতির উদ্দেশে প্রচার করা হল সেই 'আবেদন'।

চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলছিল পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের অধিবেশন। শ্রান্ত ক্লান্ত, পাংশু মুখ ভ্লাদিমির ইলিচ সেই সকালেই ঐ অধিবেশনে যোগ দিলেন।

নাবিক, শ্রমিক আর সৈনিকেরা তাঁদের প্রিয় নেতাকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হর্ষধ্বনি করে তাঁকে অভিবাদন জানালেন।

প্রলেতারিয়েতের নেতা উঠলেন বক্তৃতা-মঞ্চে। সবাই থামলে তিনি স্পষ্ট চড়া গলায় ঘোষণা করলেন:

'কমরেডসব, বলশেভিকরা এত বছর যাবত যে শ্রমিক-কৃষক বিপ্লবের আবশ্যকতার কথা বলে আসছিল সেই বিপ্লব নিষ্পন্ন হয়েছে!'

পর দিন সারা রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেস ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনকে জনকমিসার পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত করল।

ভ. বঞ্চ-ব্রুয়েভিচ

অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম দিনগুলি

অক্টোবর বিপ্লবের পরে প্রথম প্রথম দিনগুলি। সারা পেত্রগ্রাদ নগরীতে উত্তেজনা। সবার মধ্যে একটা কী-হয়, কী-হয় ভাব।

স্মল্নি লোকে ঠাসা। কত যে লোক আসছে, যাচ্ছে। স্মল্নি তখন বলশেভিকদের সাধারণ সদর কার্যালয়। তার নাম ছিল সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটি। সেখানে ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ। যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তাঁদের তিনি স্বাগত জানাতেন। দিনের ঘটনাবলীর কথা এবং প্রধানত, শীত প্রাসাদে আর সেখানে যাবার রাস্তাগুলোতে কি ঘটছে সেই সব কথা তিনি সবার কাছে জানতে চাইতেন।

স্মল্নিতে ভ্লাদিমির ইলিচের উপস্থিতির কথা বলশেভিকদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই তাঁকে আগে কখনও দেখেন নি — এখন তাঁরা দেখতে চান। তার উপর, ঘটনাবলীর সঙ্গে যাদের কোন সম্পর্ক নেই তারাও একবারটি দেখা করতে আসতে থাকল। নানা সংবদদাতা, বিশেষত বিভিন্ন বৈদেশিক সংবাদপত্রের সাংবাদিকেরা ভ্লাদিমির ইলিচের দপ্তরে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করতে থাকল। তারা লক্ষ্য করেছে যে, ওখানেই বহু লোকের যাতায়াত — কাজেই অভ্যুত্থানও নিশ্চয়ই পরিচালিত হচ্ছে সেখান থেকেই।

নির্ভরযোগ্য প্রহরীদলের দরকার হয়ে পড়ল।

স্মল্নির একটা হল-ঘরে মোতায়েন ছিল পাঁচ শ'র বেশি সশস্ত্র শ্রমিক। এ'রাই ছিলেন লালরক্ষী। প্রহরী হিসেবে কাজ করবার জন্যে তাদের মধ্যে থেকে প'চাত্তর জনকে বেছে নেওয়া হবে বলে স্থির হল।

বছর তিরিশেক বয়সের কোঁকড়ানো-চুল এক সুশ্রী তরুণ শ্রমিক তাঁর সৈনিকদের ডাক দিলেন।

মুহূর্তে প্রত্যেকেই সার বে'ধে দাঁড়িয়ে গেল। সব নিস্তব্ধ। দরজায় দরজায় সান্ত্রীরা সামরিক কায়দায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। সেনাপতি বললেন, তাঁর চাই প'চাত্তর জন স্বেচ্ছাসৈনিক, যারা প্রয়োজন হলে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হবে না।

গোটা সৈন্যদলই এক পা এগিয়ে থেমে দাঁড়াল। সেনাপতি তখন প'চাত্তর জনকে বেছে নিয়ে তাদের একজনকে সেনাপতি নিয়োগ করলেন, আর আরও দুজনকে নিয়োগ করলেন ঐ সেনাপতির বদলি হিসেবে।

'যেকোন গোলযোগ হলে কী করতে হবে তোমরা জানো,' তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন।

তাঁরা প্রথম দফায় কতকগুলি পাস তৈরি করলেন। ১ নং পাসখানা দেওয়া হল ভ্লাদিমির ইলিচকে।

'এটা কি? পাস? কিসের জন্যে?' জিজ্ঞাসা করলেন ভ্লাদিমির ইলিচ।

'এটা দরকার। কখন কি হয়। স্মলনি পাহারা দেবার জন্যে আমরা একটা প্রহরী-দল গড়ে ফেলেছি। আপনি যেন সেটা পরিদর্শন করেন।'

ভ্লাদিমির ইলিচ দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন দালানে প্রহরী-দলটি সামরিক প্রস্তুতির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তারিফ করে বললেন:

'খাসা! এদের দেখেও আনন্দ হয়!'

নিচ-তলায় ঢুকবার ফটকে এবং লেনিনের দপ্তরের ভিতরে বিভিন্ন সান্ত্রী মোতায়েন করা হল। সেনাপতি ইতোমধ্যে প্রধান বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।

ক্রমেই আরও, আরও বেশি লোক আসত থাকল — আসতেই থাকল।

*

শীত প্রাসাদ য়ুঙ্কারদের হাতে। সেখানে অস্থায়ী সরকারকে পাহারা দিচ্ছে ঐ য়ুঙ্কারেরা। সেই শীত প্রাসাদকে অবরুদ্ধ করে রয়েছে বিপ্লবের বাহিনীগুলি। কিন্তু এই অবরোধ বেশি সময় চালাতে হচ্ছে বলে ভ্লাদিমির ইলিচ একটু ভাবিত।

বিপ্লবী সৈনিকদের পক্ষে চলে এসেছিল পাভ্‌লোভ্‌স্ক রক্ষী রেজিমেণ্ট। শীত প্রাসাদে যাবার রাস্তাগুলো দখল করবার জন্যে এই রেজিমেণ্টটিকে হুকুম দেওয়া হল। এই রেজিমেণ্ট প্রাসাদের কাছে বিভিন্ন অবস্থানে মোতায়েন হল।

একটু পরেই তাদের সঙ্গে যোগ দিল নৌবহরের সৈনিকেরা। নাবিকেরা হঠাৎ হঠাৎ প্রাসাদ স্কোয়ার পার হয়ে হয়ে প্রাসাদে যাবার রাস্তাগুলো দখল করে ফেলল। শীত প্রাসাদ দখল করার লড়াই আরম্ভ হয়ে গেল। সেটা চলল কয়েক ঘণ্টা।

প্রাসাদের প্রকাণ্ড ফটকগুলো জোর করে খুলে নাবিকেরা প্রাসাদে ঢুকে পড়ল। তাদের পিছন পিছন ঢুকল পাভ্‌লোভ্‌স্ক রেজিমেণ্টের সৈনিকেরা আর লালরক্ষীরা।

কাছেই নেভা নদীর ডক-এ ভিড়ে ছিল 'অরোরা' নামে ক্রুজারখানা। 'অরোরা' কামানগুলোকে শীত প্রাসাদের উপর তাক করে সাজিয়ে রাখবার হুকুম ছিল। পিটার-পল দুর্গে মোতায়েন সৈন্যদলের উপরও ছিল একই নির্দেশ।

'অরোরার' আর দুর্গের কামান নির্ঘোষে বোঝা গেল যে, শীত প্রাসাদ দখলের লড়াই আরম্ভ হল। সিঁড়িগুলো, ঢুকবার দরজাগুলো আর বেরবার দরজাগুলো — শীত প্রাসাদের ভিতরকার এই সব মূল অবস্থান দখল করল লালরক্ষী, সৈনিক আর নাবিকেরা। ১৯১৭ সালের ২৫এ অক্টোবর বেশী রাত্রে শীত প্রাসাদ বিপ্লবী ফৌজের দখলে এসে গেল। অস্থায়ী সরকারকে গ্রেপ্তার করে কড়া পাহারায় নেওয়া হল পিটার-পল দুর্গে। নারীর ছদ্মবেশ পরে একটা গুপ্ত পথ দিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে কেরেনস্কি পালালেন; তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল মার্কিন রাষ্ট্রদূতাবাসের একখানা গাড়ি।

*

সাঁজোয়া বাহিনীর একজন সৈনিক — তার পরনে কালো চামড়ার জ্যাকেট আর চামড়ার প্যাণ্ট — হনহনিয়ে চলছিল দালান দিয়ে। তার কাঁধ থেকে ঝুলছিল একটা বার্তাবাহী ব্যাগ। ব্যাগটা যাতে ঝাঁকুনি খেতে না থাকে সেজন্যে সৈনিকটি তার বাঁ হাত চেপেছিল সেটার উপর।

দরজায় দাঁড়ানো দুজন লালরক্ষীকে সে জিজ্ঞাসা করল:

'সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটির সদর-দপ্তরটা কোথায়?'

'তুমি কার সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

৯০ 'লেনিনের সঙ্গে! তাঁর জন্যে একটা বার্তা নিয়ে এসেছি!..'

একজন সান্ত্রী ফিরে তার সাথীর সঙ্গে কথা বলল।

'তার মানে, প্রহরী-দলের একজন কর্পোরালকে চাই। এই পেয়াদার পাস নেই। সে যেতে চায় সদর-দপ্তরে — দেখা করতে চায় লেনিনের সঙ্গে।'

প্রহরী-দলের কর্পোরাল সৈনিকটির কাছে জানতে চাইলেন সে কোথা থেকে এসেছে, তাকে পাঠিয়েছে কে।

'এসেছি শীত প্রাসাদ থেকে। প্রধান সেনাপতি পদ্ভইস্কি আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'এসো আমার সঙ্গে।'

পাশের কামরায় ঢুকে সৈনিকটি বলল:

'একটা বিশেষ দরকারী বার্তা আছে। খোদ লেনিনেরই সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।'

'তা বলুন, কমরেড, কি ব্যাপার।'

'আপনিই লেনিন?'

সৈনিকটি তাকাল ভ্লাদিমির ইলিচের দিকে — তার চাউনিতে কৌতূহল স্পষ্ট ফুটে উঠল, তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল। চিঠির ব্যাগটা চটপট খুলে, একখানা কাগজ বের করে সে সেটা সশ্রদ্ধভাবে লেনিনের হাতে দিয়ে সেলাম করে বলল:

'একটা বার্তা!'

'ধন্যবাদ, কমরেড,' এই বলে ভ্লাদিমির ইলিচ করমর্দন করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

সৈনিকটি যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। সে স্মিত হেসে দু'হাত দিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচের করমর্দন করল, তারপরে আবার সেলাম করে, চোস্ত সামরিক কায়দায় ফিরে বেরিয়ে এল।

বেরতে বেরতে সে লেনিনের সই করা একখানা চিরকুট ব্যাগে পুরে নিলে।

যে খবরটা এল সেটাকে লেনিন পড়লেন জোরে জোরে:

'শীত প্রাসাদ দখল করা হয়েছে, অস্থায়ী সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কেরেনস্কি পালিয়েছে...'

তিনি বাক্যটা শেষ করতে না করতেই প্রচণ্ড 'হুররা' ধ্বনি উঠল। পাশের কামরার লালরক্ষীরা সে 'হুররা' ধ্বনি লুফে নিল।

সমস্ত কামরা আর দালানগুলো গর্জে উঠল — 'হুররা!'

*

বিপ্লবের জয়!



সোভিয়েত সরকার প্রথম বসেছিল এই স্মল্নিতে



কৃষকেরা কি ভাবছে, কেমন তাদের জীবনযাত্রা, সেটা জানা বড় দরকার



'জীবন কী চমৎকার!' এই ফোটো তোলা হয়েছিল বিপ্লবের প্রায় দু' মাস পরে।



স্মল্নি থেকে আমরা যখন বেরই তখন প্রায় ভোর চারটে। আমরা তখন শ্রান্ত-ক্লান্ত অবসন্ন, কিন্তু জয়ের আনন্দে প্রাণবন্ত। আমি ভ্লাদিমির ইলিচকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি আমাদের বাড়িতে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবেন কিনা। আমি আগেই রোঝ্দেস্ত্ভেন্স্কি পাড়ায় ফোন করে বলে রেখেছিলাম যে, সশস্ত্র শ্রমিকদলগুলি যেন লাগাও রাস্তাগুলো নিরাপদ রাখে।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম স্মল্নি থেকে। নগরী তখন অন্ধকার। গাড়ি করে আমরা চললাম আমার বাড়ির দিকে।

ভ্লাদিমির ইলিচ ভীষণ ক্লান্ত ছিলেন — তিনি গাড়িতেই ঝিমোচ্ছিলেন। বাড়ি গিয়ে আমরা যা জুটল তাই খেয়ে নিলাম। ভ্লাদিমির ইলিচ যাতে একটু স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন সেজন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলাম। আমার ছোট কামরাটায় ছিল ডেস্ক, কাগজ, কালি আর আমার গ্রন্থাগার — সেখানে একটা বিছানায় শুতে তাঁকে রাজি করাতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। শেষে তিনি রাজি হলে আমরা রাতের মতো বিদায় নিলাম।

আমি শুলাম পাশের কামরায় একখানা কৌচে। মনে মনে ভাবছিলাম যে, ভ্লাদিমির ইলিচ ঘুমিয়ে পড়েছেন বলে নিশ্চিত হয়ে তবে আমি ঘুমোব।

নিরাপত্তার খাতিরে আমি প্রত্যেকটা তালা বন্ধ করেছিলাম; সামনের দরজায় শিকলও লাগিয়ে দিয়েছিলাম। দরজা ভেঙে ঢুকে ভ্লাদিমির ইলিচকে খুন করবার চেষ্টা হতে পারে — তাই ভেবে একটা পিস্তলও তৈরি রেখেছিলাম। কী না হতে পারে!

কী জানি যদি দরকার হয়, তাই যতদূর মনে ছিল সব টেলিফোন নম্বর টুকে রেখেছিলাম: তার মধ্যে বিভিন্ন কমরেডের, স্মল্নির, জেলা শ্রমিক কমিটিগুলির আর ট্রেড ইউনিয়নগুলির ফোন নম্বর। মনে মনে বলেছিলাম: 'টুকে রাখাই ভালো, কী জানি, কোন জরুরী অবস্থায় যদি ভুলে যাই!'

ভ্লাদিমির ইলিচ নিজের কামরায় আলো নেবালেন। তাহলে বোধহয় ঘুমোলেন! চারদিকে সব নিস্তব্ধ। আমি প্রায় ঘুমিয়ে পড়ছিলাম — এমন সময়ে দেখি ভ্লাদিমির ইলিচের কামরার দরজার নিচে ফাঁক দিয়ে এক ফালি আলো পড়েছে।

আমি হুঁশিয়ার থাকলাম। আমি বুঝলাম তিনি আস্তে উঠে দরজা খুললেন। আমি ঘুমিয়ে আছি 'বুঝে নিয়ে' তিনি পা টিপে টিপে গেলেন ডেস্কে। সেখানে বসে, দোয়াতের ঢাকনিটা খুলে, কিছু কাগজ মেলে নিয়ে তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন। দরজায় একটা ফাঁক দিয়ে আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম।

ভ্লাদিমির ইলিচ কিছু লিখছিলেন, কিছু কেটে দিচ্ছিলেন, তারপরে অন্য একখানা কাগজে কিছু লিখে নিচ্ছিলেন। শেষে তিনি সবটা পরিষ্কারভাবে নকল করে তুললেন।

ভোর হয় হয়। শরৎকালের শেষের দিকের সেই পেত্রগ্রাদে তখন দিনের আলো ফুটে উঠছিল। ভ্লাদিমির ইলিচ আলো নিবিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে পড়লাম আমিও।

সকালে আমি সবাইকে খুব চুপচাপ থাকতে বললাম। সবাইকে বললাম, তিনি একরকম সারা রাতই কাজ করেছেন — তাঁর ঘুম দরকার।

হঠাৎ দরজা খুলে তিনি বেরিয়ে এলেন। ইতোমধ্যে তিনি পুরোপুরি পোশাক পরে নিচ্ছিলেন। তাঁকে দেখাচ্ছিলও বেশ তাজা আর সতেজ। তাঁর মুখে ছিল স্মিত হাসি।

'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই প্রথম দিনে আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি!'

তখন তাঁর মুখে ক্লান্তির লেশ মাত্র নেই। দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি খাসা ঘুমিয়ে উঠলেন, অথচ, বিশ ঘণ্টা অতি কঠোর পরিশ্রমের পরে তিনি দু'-তিন ঘণ্টার বেশি ঘুমোন নি।

কয়েক জন কমরেড এলেন। সবাই মিলে খেতে বসা হল। নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্‌নাও সে রাত্রে আমাদের বাড়িতে ছিলেন — তিনিও এলেন চায়ের টেবিলে। ভ্লাদিমির ইলিচ পকেট

 থেকে কয়েকখানা কাগজ বের করে আমাদের পড়ে শুনালেন তাঁর সেই বিখ্যাত 'ভূমির ডিক্রি'*। ঐ চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক দিনগুলিতে তিনি ঐ ডিক্রি রচনা করছিলেন।

স্মল্‌নির দিকে হেঁটে যেতে যেতে আমরা একখানা ট্রাম পেয়ে তাতে উঠলাম। রাস্তায় রাস্তায় সুশৃঙ্খলা দেখে ভ্লাদিমির ইলিচের মুখ খুশির স্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় দ্বিতীয় সারা রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেসে প্রথমে গৃহীত হল 'শান্তির ডিক্রি'**। তারপরে, স্পষ্ট, অনুরণিত কণ্ঠে ভ্লাদিমির ইলিচ প্রতিনিধিদের সামনে পেশ করলেন 'ভূমির ডিক্রি'। সোৎসাহে সর্বসম্মতিক্রমে সেটা গৃহীত হল।

---

* 'ভূমির ডিক্রি' — ভূমি সম্বন্ধে প্রথম সোভিয়েত আইন। তাতে, ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা চিরতরে রহিত করা হল। ভূমি হল সমগ্র জনগণের সম্পত্তি।

** 'শান্তির ডিক্রি' — সমস্ত শ্রমজীবী জনগণ এবং তাদের সরকারগুলির উদ্দেশে সোভিয়েত সরকারের শান্তি-প্রস্তাব সংক্রান্ত ডিক্রি। যুদ্ধ বন্ধ করা এবং ন্যায্য আর গণতন্ত্রসম্মত শান্তি স্থাপনের আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করবার জন্যে তাতে আহ্বান জানানো হয়েছিল।

স. আলেক্সেয়েভ

রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের একজন নাগরিক

পেত্রগ্রাদে লিতেইনি স্ট্রীটে একটা বড় বাড়ির মাটির তলার কুঠরিতে থাকত দানিল্‌কা। ঐ বাড়িতেই তার জন্ম; বাড়ির সমস্ত বাসিন্দাকেই সে জানত।

নিচ তলায় থাকতেন কাউণ্টিস শেচরবাৎস্কায়া, দোতলায় প্রিন্স পিরগোভ-পিশচায়েভ, তেতলায় প্রিভি কাউন্সিলর গরখোভ, আর উপর তলায় স্টেট কাউন্সিলর আর্দাতোভ। সবার উঁচু দরের খেতাব — কারও একটু বেশি, কারও একটু কম। বাড়িটায় সাধারণ মানুষ ছিল শুধু দানিল্‌কার মা-বাবা।

বিপ্লব ঘোষিত হবার পরে গত কয়েক দিনে অনেককিছু ঘটে গিয়েছিল। দানিল্‌কা ভাবল আর কোন আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে না। কিন্তু সেই দিনই তার বাবা খবরের কাগজ এনে খুলে ধরে তাকালেন ছেলের দিকে।

'দেখছো তো,' তিনি বললেন, 'এখন থেকে তুমি রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের নাগরিক। এই যে, এখানে লেখা রয়েছে। ভ্লাদিমির উলিয়ানভ-লেনিন এই ডিক্রি সই করেছেন।'

খেতাবটা শুনতে তো বেশ জমকালো, কিন্তু জিনিসটা যে কী তা দানিল্‌কা বুঝতে পারছিল না। সে জিজ্ঞাসা করল:

'ওটা কি স্টেট কাউন্সিলরের চেয়ে বড়?'

'হ্যাঁ,' এই উত্তর দিয়ে ওর বাবা মুচকি হাসলেন।

'প্রিভি কাউন্সিলরের চেয়ে বড়?'

'হ্যাঁ, তার চেয়েও বড়।'

'আর, কাউণ্টের চেয়েও?'

'হ্যাঁ।'

'আর, প্রিন্সের চেয়েও?'

'প্রিন্সের চেয়ে ঢের বড়।' এতক্ষণে ওর বাবা হাসতে আরম্ভ করলেন।

বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে দানিল্‌কা ছুটে বেরিয়ে গেল। দেখা হল ভানিয়া দজোরোভের সঙ্গে। দানিল্‌কা তাকে বলল:

'জানিস, আমি একটা বড়ো খেতাব পেয়েছি, জানিস? আমার খেতাব স্টেট কাউন্সিলরের চেয়ে বড়, প্রিভি কাউন্সিলরের চেয়ে বড়, কাউন্ট কিংবা প্রিন্স-এর চেয়েও বড়! আমি রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের নাগরিক! কাগজে লেখা রয়েছে। ডিক্রিতে সই দিয়েছেন ভ্লাদিমির উলিয়ানভ-লেনিন।'

এরপরে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দানিল্‌কার দেখা হল ল্যুবা কোজুলিনার সঙ্গে — তাকেও আবার বলল সেই খবর:

'জানিস, আমার খেতাবটা কী? এটা অনেক বড়...'

অনেক বন্ধুর সঙ্গে সেদিন দানিল্‌কার দেখা হল। প্রত্যেককেই সে ঐ একই বিরাট খবর বলল। শেষে ভীষণ হাঁপিয়ে গিয়ে জিরোতে বসল তাদের বাড়ির বাইরে।

সে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না যে, উলিয়ানভ-লেনিন তার কথা জানলেন কেমন করে। কে বলল লেনিনকে? বসে বসে ভাবছে তো ভাবছেই, এমন সময় ছুটতে ছুটতে এল লাল-চুলো কিরিল। তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল — তবু, বলল চেঁচিয়ে:

'জানিস, আমি কে? আমি রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের নাগরিক।'

দানিল্‌কা ভীষণ হকচকিয়ে গিয়ে হিক্কা তুলল।

'কী বলছিস তুই?' দানিল্‌কা বলল দেমাক দেখিয়ে, 'নাগরিক — সে তো আমি! তা কাগজেও বেরিয়েছে — দেখ গে যা। সব তো আমার কথা।'

'তোর!' সিটি মেরে বিদ্রূপ করে কিরিল বলল, 'তোর কথা লিখে কাগজ নষ্ট করবে কে রে?'

দানিল্‌কা আর সহ্য করতে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে মারল এক ঘা।

আরম্ভ হল ঘুষোঘুষি, ধস্তাধস্তি।

'আমি নাগরিক!' গর্জে উঠল দানিল্‌কা।

পাল্টা চেঁচিয়ে কিরিল বলল:

'না, তুই না! নাগরিক আমি!..'

ঠিক তখুনই সেখান দিয়ে যাচ্ছিল একজন তরুণ শ্রমিক। সে ছেলে দুটিকে ছাড়িয়ে দিল — কিন্তু ওরা কিছুতেই বলে না মারামারিটা কেন। কিন্তু, শেষে বলল। শ্রমিকটি চাপা হেসে পকেট থেকে একখানা খবরের কাগজ বের করল। তখন তারা তিন মাথা এক করে আস্তে আস্তে পড়তে আরম্ভ করল।

'জমিদারি আর সরকারী খেতাব তুলে দেবার ডিক্রি।' তাতে ছিল যে, অভিজাত, সওদাগর আর পেটি বুর্জোয়ার মতো সব পদ-পদবি, আর প্রিন্স, কাউন্ট, প্রিভি কাউন্সিলর, স্টেট কাউন্সিলর ইত্যাদি খেতাব তুলে দেওয়া হবে। তার বদলে রাশিয়ার সমস্ত অধিবাসী এখন থেকে রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের নাগরিক বলে পরিচিত হবে। ডিক্রির নিচে সই ছিল: 'জনকমিসার পরিষদের সভাপতি ভ. উলিয়ানভ (লেনিন)।'

'এবার বুঝলে তো?' সেই শ্রমিকটি বলল, 'তোমরা দুজনেই ঠিক বলেছ।' দানিল্‌কার দিকে দেখিয়ে সে বলল, 'তুমি রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের নাগরিক', আবার কিরিলকে দেখিয়ে সে বলল, 'তুমিও তাই।' তারপরে সে বলল, 'আমিও নাগরিক। এখন আমরা সবাই রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের নাগরিক। দেশের সমস্ত মেহনতী মানুষের জন্যে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন সেই ডিক্রি রচনা করেছেন।'

দানিল্‌কা দেখল যে, ডিক্রিটা শুধু তার জন্যে নয় — সবারই জন্যে, তাই, প্রথমে সে হতাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু পরে সে ভেবে ভেবে বুঝল যে, এটাই তো ভাল: ভ্লাদিমির উলিয়ানভ-লেনিন তাঁর ডিক্রিতে সবাইকে ধরেছেন — এটাই তো ভাল: সবাইকে — তার মা-বাবাকে, তার

বন্ধুবান্ধব, জানাশোনা সবাইকে তিনি ধরেছেন, তিনি কাউকে বাদ দেন নি, এটাই তো ভাল! সাবাস লেনিন!

তবে, কাউণ্টেস শেচরবাৎস্কায়া, প্রিন্স পিরগোভ-পিশচায়েভ, প্রিভি কাউন্সিলর গরখোভ আর স্টেট কাউন্সিলর আর্দাতোভ লেনিনের ডিক্রি দেখে খুশি হয়েছেন বলে মনে হল না। তারা হুড়মুড় করে দেশ ছেড়ে চলে গেল। বেশ হল—আপদ বিদেয় হল! লিতেইনি স্ট্রীটে সেই বড় বাড়িটায় তখন নতুন নতুন বাসিন্দা এল। এইসব পরিবারই দানিল্‌কার মা-বাবার মতো সাধারণ মানুষ — তারা সবাই মেহনতী মানুষ। এখন তারা সবাই নাগরিক — এবং, শুধু তাই নয়: তারা সবাই মিলে দেশের কর্তা।

স. আলেক্সেয়েভ

জিম্মাদার

পেত্রগ্রাদে স্মল্নিতে কমরেড লেনিনের সঙ্গে তাঁরা দেখা করতে এলেন। তাঁরা হলেন কস্ত্রোমা অঞ্চলের একদল কৃষক প্রতিনিধি। তাঁদের গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট, মাথায় ফার টুপি, আর পায়ে বাস্ট জুতো। প্রত্যেকের কাঁধে ঝুলছে এক একটা থলে।

তখন স্মল্নিতে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি দারুণ ভিড়: শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, লালরক্ষী আর নাবিকদের ভিড়। এতসব মানুষের কথাবার্তা চলছে যেন মৌচাকে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো।

কস্ত্রোমার কৃষকেরা চলেছেন লম্বা লম্বা বারান্দা দিয়ে। তাঁরা তাকাচ্ছেন চারদিকে: কোথায় লেনিন!

ভ্লাদিমির ইলিচ হল-ঘর ধরে এগিয়ে এলেন তাঁদের দিকে।

কস্ত্রোমার কৃষক প্রতিনিধিরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন:

'আচ্ছা, মশাই, বলতে পারেন, এখানকার জিম্মাদার মানুষটি কোথায় বসেন?'

ভ্লাদিমির ইলিচ জিজ্ঞাসা করলেন:

'কে?'

'এখানকার জিম্মাদার মানুষটি। রাশিয়া এখন যাঁর জিম্মায়।'

'ও, বুঝেছি, জিম্মাদারকে চাইছেন!' লেনিন চাপা হেসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাছেই এক দল শ্রমিককে দেখে বললেন:

'এ'রাই এখন জিম্মাদার।' এই কথা বলে তিনি চতুর হাসি হেসে যে দিকে যাচ্ছিলেন সে দিকে এগিয়ে চললেন।

সেই শ্রমিকদের কাছে কৃষক প্রতিনিধিরা জিজ্ঞাসা করলেন:

'আপনাদের মধ্যে কমরেড লেনিন কে?'

'লেনিন?!' তাঁরা ভীষণ অবাক হয়ে বললেন।

'বুঝতে পারছেন না? এখানকার জিম্মাদার মানুষটি। যিনি সারা রাশিয়ার জিম্মাদার। বুঝতে পারছেন এখন?'

শ্রমিকদের একজন বললেন:

'লেনিনকে এখানে পাবেন না! তিনি উপরে আছেন — তিন তলায়।' তিনি সি'ড়ি দেখিয়ে দিলেন।

কৃষক প্রতিনিধিরা সি'ড়ি বেয়ে উঠলেন তিন তলায়। তাঁরা আবার লেনিনকে দেখলেন: তিনি চলতে চলতে কাদের সঙ্গে খুব গরম গরম কী একটা আলোচনা করছিলেন। লেনিন ওঁদের চিনতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন:

'কি, কমরেডসব, পেলেন তাঁকে? এখনকার জিম্মাদারকে পেলেন?'

'না, তো,' তাঁরা জানালেন।

'জিম্মাদার ঐ, ওখানে।' লেনিন ওঁদের পিছনে দেখিয়ে চতুর হাসি হাসলেন।

কৃষক প্রতিনিধিরা ফিরে তাকালেন। কয়েক ফুট দূরে তাঁরা এক দল সৈনিককে দেখতে পেলেন। কিছু দূরে হল-ঘরে ওধারে একদল নাবিক। তাদের কাছে আর একদল কৃষক। সেই কৃষকদেরও গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট, মাথায় ফার টুপি, পায়ে বাস্ট জুতো, আর তাদেরও সবার কাঁধ থেকে ঝুলছে সব থলে। তারাও বহু দূর থেকে এসেছে—সব কৃষক প্রতিনিধ।

কৃষকেরা বলতে থাকলেন:

'দেখা যাচ্ছে, এখানে জিম্মাদার কেউ নেই। ঐ দাড়িওয়ালা লোকটা না জেনে সব যা-তা বলে গেল!'

কিন্তু, দু' বার এইভাবে ভুল দেখাল — ঐ লোকটা কে? এটা তাঁদের জানতে ইচ্ছা হল। তাঁরা গেলেন সেই সৈনিক দলটির কাছে। তাঁদের কাছে ওঁরা জিজ্ঞাসা করলেন:

'ঐ দাড়িওয়ালা লোকটা কে, বলতে পারো ভাই?'

'অ্যা! উনি? উনি তো কমরেড লেনিন।'

কৃষক প্রতিনিধিরা তো হতভম্ব। তাঁদের একজন বললেন:

'না, না। আপনারা ঠিক বুঝতে পারছেন না।'

কৃষক প্রতিনিধিদের আর একজন নিজেদের মধ্যে বললেন:

'ব্যাপারটাকে তো বড় অদ্ভুত মনে হচ্ছে, হে!'

ওঁরা ছিলেন তিন জন। তখন আর দুজনে তাকালেন অন্য জনের দিকে। তিনি বয়সে সবার বড়। তিনি গভীরভাবে কি ভাবছিলেন — কিছু বললেন না। তাঁর কপালে বলিরেখা ফুটে উঠেছিল। ওঁরা দুজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন:

'কী ভাবছ বলো তো ভাই!'

'কী ভাবছি? যা ওরা বলেছে, তাই ঠিক আছে — আবার কী?' এই কথা বলে বৃদ্ধ হঠাৎ মুচকি হাসলেন। তিনি বললেন, 'চলো, দেখা যাক!'

কৃষক প্রতিনিধিরা তাঁদের থলেগুলো কাঁধে তুলে নিয়ে আবার চললেন লেনিনের দপ্তরের দিকে। সেখানে সচিব জিজ্ঞাসা করলেন:

'আপনারা কার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন?'

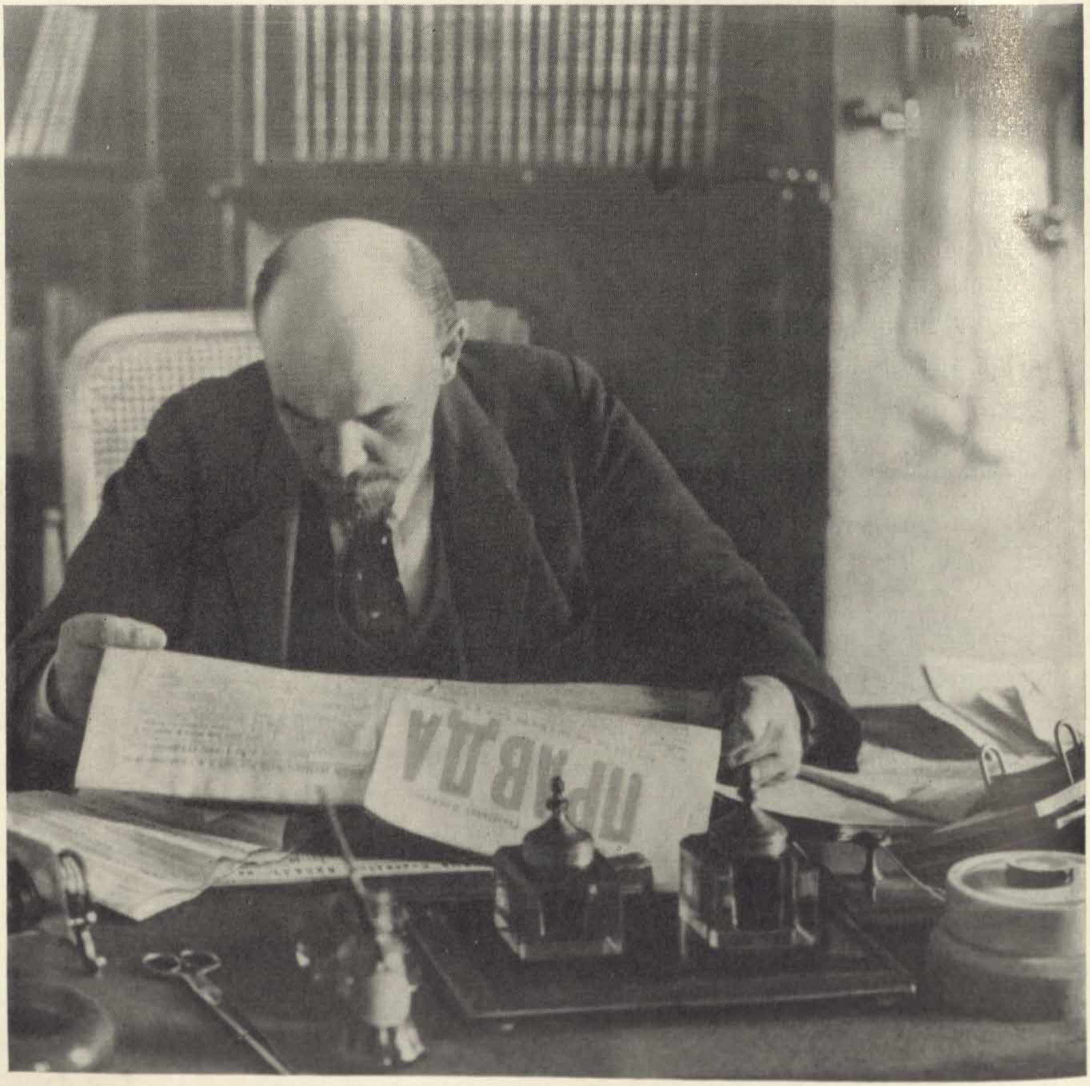
'কমরেড লেনিনের সঙ্গে।'

'কে দেখা করতে এসেছেন, বলব?'

বয়সে সবার চেয়ে বড় কৃষক তাঁর সঙ্গীদের দিকে একবার তাকিয়ে, গোঁফে একবার হাত বুলিয়ে বললেন:

'বলুন, এসেছেন এখানকার জিম্মাদার! বলুন, সারা রাশিয়া এখন যাঁদের জিম্মায় তাঁরা এসেছেন।'

প্রত্যেকটি সকালের শুরুতে খবরের কাগজ। দেশে এবং বিদেশে নতুন কি ঘটল জানা চাই। ক্রেমলিনে তাঁর কাজের কামরায় তোলা হয়েছিল এই ফোটোখানা। ফোটো তোলা হয়েছিল তাঁর অজানতে।



বিষাক্ত বুলেট দিয়ে লেনিনকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল এক গুপ্তঘাতক। ভীষণ জখম সেরে উঠবার পরে লেনিন ক্রেমলিনের চত্বরে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। অক্টোবর, ১৯১৮





'ও! তা বেশ, নিন ফোটো তুলে!'



লেনিনের লাইব্রেরিতে বই ছিল হাজার হাজার। ভ্লাদিমির ইলিচ জার্মান, ফরাসী আর ইংরেজি জানতেন বেশ ভাল।



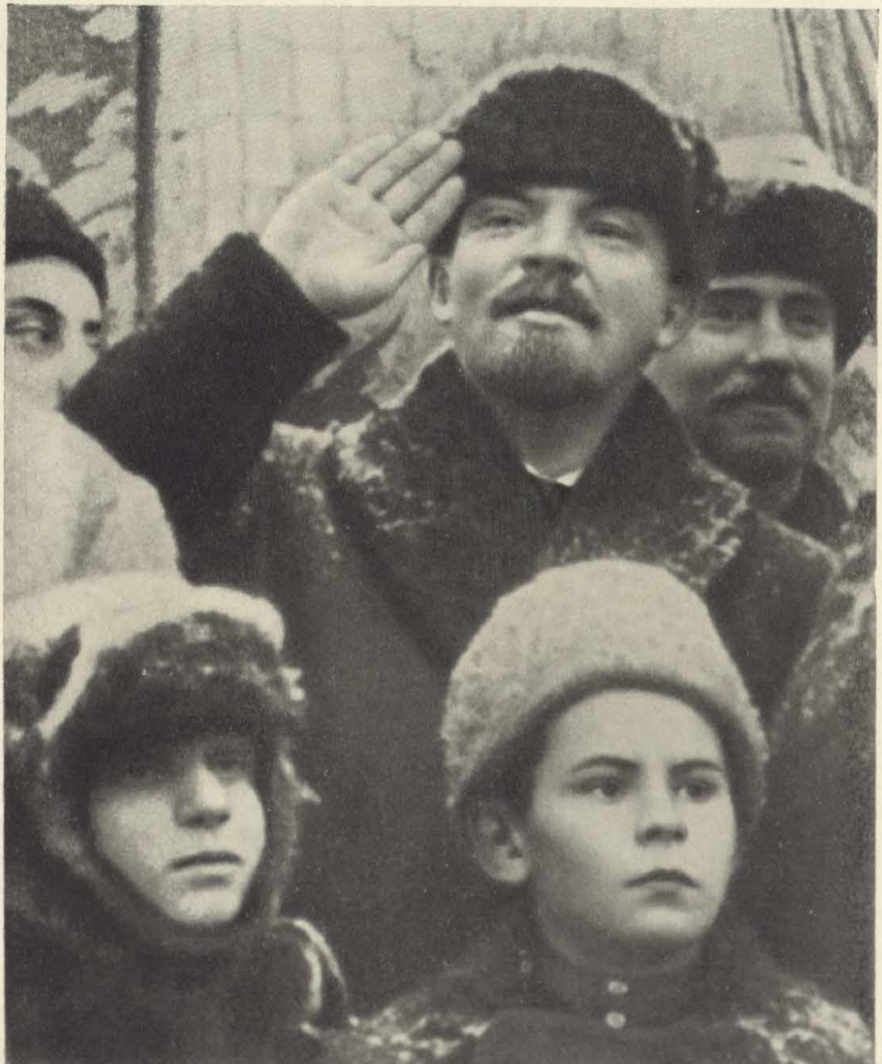
কার্ল মার্ক্স এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের উদ্দেশে স্থাপিত অস্থায়ী স্মৃতিসৌধ উন্মোচন। এখন সেখানে রয়েছে গ্র্যানিট পাথরের স্মৃতিসৌধ।



ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলছেন লেনিন। মে দিবস, ১৯১৯



বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকী। রেড স্কোয়ারে মিছিল পরিদর্শন। লেনিনকে ঘিরে রয়েছে বাচ্চারা — এমনিই হত সব সময়ে।



'বিদ্যুৎসজ্জিত দেশ হবে রাশিয়া!' — অষ্টম সোভিয়েত কংগ্রেসে বিবরণী দিচ্ছেন লেনিন।



সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতীক-চিহ্ন

তখন আমাদের দেশে সবকিছুই নতুন করে তৈরি হচ্ছিল। একটা নতুন রাষ্ট্রীয় প্রতীক-চিহ্নেরও দরকার হল। মানবজাতির ইতিহাসে এমন প্রতীক-চিহ্ন আর কখনও ছিল না। এটা হল পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রের প্রতীক-চিহ্ন।

নতুন প্রতীকের একটা খসড়া আমি পেলাম ১৯১৮ সালের গোড়ার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আমি সেটা নিয়ে গেলাম ভ্লাদিমির ইলিচের কাছে।

ভ্লাদিমির ইলিচ তখন তাঁর আপিস-ঘরে ছিলেন। স্ভের্দলভ, জের্জিনস্কি* এবং আরও কয়েক জন কমরেডের সঙ্গে তিনি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময়ে প্রতীকের খসড়াটা আমি দিলাম লেনিনের ডেস্কে।

'এই হল নতুন প্রতীক?' খুঁটিয়ে দেখবার জন্যে ডেস্কের উপর ঝুঁকে লেনিন বললেন, 'আচ্ছা, দেখা যাক ভাল করে।' সবাই চারদিক থেকে ঘনিয়ে এলেন।

লাল পটভূমিতে উদীয়মান সূর্যের কিরণমালা — সবটা ঘিরে গমের শিষ, আর কেন্দ্রস্থলে আড়াআড়ি করে আঁকা হাতুড়ি আর কাস্তে। গমের শিষগুলোর গোড়া থেকে উপরে কিরণমালার দিকে উঠেছে একখানা তলোয়ার।

'চিত্তাকর্ষক বটে!..' বললেন ভ্লাদিমির ইলিচ। 'ভাবটা ঠিকই, কিন্তু তলোয়ারখানা কিসের জন্যে?' এই বলে তিনি একে একে আমাদের সবার দিকে তাকালেন। 'আমরা সংগ্রাম চালাচ্ছি: প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা অবধি এবং দেশ থেকে শ্বেতরক্ষী আর আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারীদের বিতাড়িত করা অবধি আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো। কিন্তু আমরা তো উৎপীড়নের পক্ষপাতী নই। যে কোন আগ্রাসী কর্মনীতি আমাদের কাছে বিজাতীয়। আমরা আক্রমণ চালাচ্ছি নে — আমরা শত্রুর আক্রমণ রুখছি। আমরা যে যুদ্ধ চালাচ্ছি সেটা আত্মরক্ষার যুদ্ধ; তলোয়ার আমাদের প্রতীক হতে পারে না। যতদিন আমাদের শত্রু আছে, যতদিন আমাদের উপর আক্রমণ চলবে এবং বিপদ আসতে থাকবে ততদিন আমরা দৃঢ়হস্তে তলোয়ার ধরব; কিন্তু তাই বলে এমন অবস্থা চিরকাল থাকবে এমন তো নয়। যখন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সৌভ্রাত্র ঘোষিত এবং প্রতিষ্ঠিত হবে তখন আর আমাদের তলোয়ারের দরকার থাকবে না। আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতীক থেকে ওটাকে বাদ দিতে হবে।' এই বলে ভ্লাদিমির ইলিচ একটা

---

* ইয়াকভ স্ভের্দলভ (১৮৮৫—১৯১৯) এবং ফেলিক্স জের্জিনস্কি (১৮৭৭—১৯২৬) — কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের দুজন বিশিষ্ট নেতা।

পেন্সিল তুলে নিয়ে তলোয়ারখানার উপর কাটার দাগ দিলেন। 'বাদবাকিটাই চমৎকার প্রতীক। আমার মনে হয় এটাকে আমরা অনুমোদন করতে পারি। এর পরে ওটাকে আর একবার দেখা যাবে; জনকমিসার পরিষদে আবার এটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। বিষয়টাকে ফেলে রাখা ঠিক নয়।' ছবিটার এক কোণে তিনি নাম সই করে দিলেন।

শিল্পী আন্দ্রেয়েভকে আমি ছবিখানা দিলাম, তিনি তখন লেনিনের আপিস ঘরে ছিলেন। দেয়ালের কাছে একখানা কৌচে বসে তিনি ভ্লাদিমির ইলিচের একটি আবক্ষ মূর্তির জন্যে কাজ করছিলেন। আন্দ্রেয়েভ প্রতীকটা আবার নকল করলেন — তখন সেটা আরও স্পষ্ট এবং ত্রিমাত্রিক হয়ে উঠল। বলা বাহুল্য, তলোয়ারখানাকে তিনি বাদ দিলেন।

রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতীকের খসড়াটাকে ভ্লাদিমির ইলিচ যেভাবে সংশোধন করলেন সেইভাবে সেটা ১৯১৮ সালের ১৯এ জুলাই তারিখে অনুমোদিত হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতীকেও আছে হাতুড়ি আর কাস্তে আর উদীয়মান সূর্যের কিরণমালা ঘিরে সোনালী গমের শিষ। শান্তি আর শ্রমের এই সুন্দর প্রতীক অনুসারেই চলে সোভিয়েত দেশের মানুষ; এই প্রতীক নিয়ে তারা চলেছে কমিউনিজমের দিকে।

আ. কনোনভ

ঘাতকের বুলেট

কারখানার প্রধান কর্মশালায় সভা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল — তবু, তখনও বাইরে চত্বরে প্রকাণ্ড ভিড়। সবাই ভ্লাদিমির ইলিচের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

শেষে একখানা মোটরগাড়ি এসে থামল ঢুকবার ফটকে। গাড়ির দরজা খুলে গেল, সবাই দেখল — লেনিন।

ভ্লাদিমির ইলিচ শ্রমিকদের অভিবাদন জানিয়ে অভ্যাসমতো হনহনিয়ে কর্মশালার দরজার দিকে চললেন। সবাই ঢুকল তাঁর পিছু পিছু। চত্বরটা খালি হয়ে গেল।

ড্রাইভার গাড়িখানাকে ঘুরিয়ে ফটক থেকে প্রায় পনর ফুট দূরে রাখলেন। তিনি বসে রইলেন লেনিনের অপেক্ষায়।

কয়েক মিনিট পরে কালো পোশাক-পরা একটি স্ত্রীলোক এসে জিজ্ঞাসা করল:

'কমরেড লেনিন এখুনই ভিতরে গেলেন — তাই না?'

ড্রাইভার বললেন:

'কী করে জানব কে গেলেন ভিতরে।'

'আপনি ড্রাইভার — আপনি জানেন না কাকে নিয়ে এলেন?'

তাকে নাছোড়বান্দা দেখে ড্রাইভার বিরক্ত হলেন।

তিনি ভ্রূ কুঁচকে বিড়বিড় করে বললেন:

'না, জানি নে!'

হঠাৎ স্ত্রীলোকটি ফিরে কর্মশালার দিকে গেল।

আধ ঘণ্টা পরে সভা শেষ হল। কারখানার দরজাগুলো খুলে গেল — ভ্লাদিমির ইলিচ বেরিয়ে এলেন।

কয়েক জন মেয়ে শ্রমিক বেরলেন তাঁর পরে। বাদবাকি সবাই তখন দরজার কাছে। নাবিকের উর্দি-পরা একটি লোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দু'বাহু ছড়িয়ে দিল।

ভাঙা গলায় সে বলল:

'চাপ দিয়ো না! ঠেলো না!'

তার মুখখানা ফুলো-ফুলো, তার চোখ দুটো যেন পাক খাচ্ছিল। তাকে নাবিকের মতো দেখতে শুধু উর্দিটার জন্যে।

দু' হাত দিয়ে সে দরজার দুটো পাল্লা চেপে ধরে চত্বরের দিকে তাকিয়ে ছিল। শ্রমিকেরা মনে করল লোকটি বুঝি লেনিনকে পাহারা দিচ্ছে — তাই, তারা এগোল না।

ঠিক তখন লেনিন গাড়ির কাছে এলেন।

তিনি গাড়ির দরজায় হাত দিয়েছেন — এমন সময় মেয়েদের একজন তাঁকে কি জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেবার জন্যে তার দিকে মুখ ফেরালেন।

হঠাৎ একটা গুলি চলল, তারপরে আর একটা। লেনিন পড়ে গেলেন।

শ্রমিকেরা সেই নাবিকটিকে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে গেল লেনিনের দিকে।

ড্রাইভার লাফিয়ে নেমে এলেন — তাঁর হাতে পিস্তল। গাড়ির বাঁদিকে তিনি একটি স্ত্রীলোককে দেখতে পেলেন — সেই স্ত্রীলোকটি যে লেনিনের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি ভিড়ের মধ্যে স্ত্রীলোকটির দিকে ধেয়ে গেলেন — তাকে তিনি পিস্তল তাক করে গুলি করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে ফিরে দেখলেন লেনিন মাটিতে পড়ে আছেন।

ড্রাইভার ছুটে গিয়ে তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন।

কে যেন বলল:

'যত তাড়াতাড়ি পারেন হাসপাতালে নিয়ে যান!'

লেনিন মাথা তুলে ক্ষীণ স্বরে বললেন:

'না, বাড়িতে... বাড়িতে...'

ড্রাইভার শ্রমিকদের বললেন:

'আমি ওঁকে বাড়িতেই নিয়ে যাচ্ছি। কোন হাসপাতালে নেব না!'

শ্রমিকেরা ঝুঁকে পড়ে লেনিনকে গাড়িতে তুলে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি বহু কষ্টে আস্তে আস্তে উঠে বললেন:

'আমি নিজেই পারব...'

তাঁর মুখখানা তখন অত্যন্ত ফ্যাকাসে। বহু কষ্টে তিনি গাড়িতে উঠলেন, কিন্তু বসে থাকতে পারলেন না — কাত হয়ে পড়লেন। ড্রাইভার দরজা বন্ধ করে লাফিয়ে উঠে গাড়ি চালিয়ে দিলেন।

যে স্ত্রীলোকটি গুলি চালিয়েছিল সে ঠিক সেই সময়ে ধরা পড়ে গেল। সে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু চত্বরে ছোট ছেলেমেয়েরা ছিল, তারা চেঁচাতে লাগল:

'ঐ যায়! ঐ যায়! ও গুলি করেছে!'

এটা ১৯১৮ সালের ৩০এ অগস্ট তারিখের ঘটনা।

সোভিয়েত রাশিয়ার সমস্ত শ্রমিক আর কৃষক, সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষ মহা উদ্বেগে আর আশা নিয়ে লেনিনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খবরের কাগজে বিবরণ দেখতে থাকল।

খবরের কাগজে খবর বেরল যে, যে স্ত্রীলোকটি লেনিনকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল তাকে পাঠিয়েছিল জন-শত্রুরা। বুলেটে তারা লাগিয়ে দিয়েছিল অতি তীব্র বিষ।

লেনিনের জখম ছিল অত্যন্ত গুরুতর। তিনি বাঁচবেন বলে ডাক্তারেরা তেমন আশা করতে পারেন নি।

কিন্তু শেষে একদিন খুশির খবর বেরল — লেনিন সেরে উঠছেন।

সেই কারখানায় আর একটা সভা হল। একজন শ্রমিক খবরের কাগজ থেকে সেই খবর জোরে জোরে পড়ে শোনালেন। একজন বর্ষীয়সী মেয়ে শ্রমিক চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাঁর বক্তৃতায় বললেন:

'আমরা তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান ছিলাম না... ঘাতকের বুলেট থেকে তাঁকে আমরা আগলাতে পারি নি। তাঁর কী ভয়ানক অবস্থাই না হয়েছিল!'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি কমরেডদের দিকে তাকিয়ে বললেন সবারই মনের কথাটি:

'কী সৌভাগ্য আমাদের — আমাদের লেনিন রয়েছেন!'

ভ. বঞ্চ-ব্রুয়েভিচ

ভ্রমণ

অসুস্থতার সময়ে ভ্লাদিমির ইলিচের কাছে অসংখ্য চিঠি আসত, বহু শ্রমিক প্রতিনিধিদল তাঁকে দেখতে আসত। সবার ভীষণ মন খারাপ, সবাই জানতে চায় তিনি কেমন আছেন। ভ্লাদিমির ইলিচ যখন উঠে অল্প অল্প বেড়াতে আরম্ভ করলেন তখন সবাইকে জানানো হল যে, তিনি সেরে উঠছেন। তাতে সবার বড় আনন্দ। তবু, শ্রমিকদের উদ্বেগ দূর হয় না। তারা স্বচক্ষে তাঁকে দেখতে চায়।

ডাক্তারদের কাছে আমরা জানতে চাইলাম ভ্লাদিমির ইলিচ কখন সভায় বক্তৃতা করতে পারবেন। ডাক্তারেরা বললেন, তিন মাসের আগে নয়। ভ্লাদিমির ইলিচের একটা ছোট চলচ্চিত্র তৈরি করবার ব্যবস্থা হল। ক্যামেরাম্যান বলতিয়ান্‌স্কির উপর এ কাজের ভার পড়ল। কিন্তু ফোটো তোলা হবে সেটা লেনিনকে জানতে দেওয়া যাবে না — কেননা, তিনি কিছুতেই রাজি হতেন না। আমরা ব্যবস্থা করলাম — প্রথম রোদে-ঝলমলে দিনে বলতিয়ান্‌স্কি এবং তাঁর সহকারীরা ক্রেমলিনে আসবেন। অস্ত্রাগারের পাশ দিয়ে জারের কামানের* দিকে যাবার শান বাঁধানো পথে বিভিন্ন জায়গায় তাঁর সহকারীরা লুকিয়ে ক্যামেরা পেতে রাখবেন। ভ্লাদিমির ইলিচ সাধারণত ঐ পথেই বেড়াতে যেতেন।

সব হওয়া চাই চটপট: মূল চলচ্চিত্রখানার অনেকগুলি 'কপি' করার দরকার ছিল। তাহলে দেশের সব জায়গায় শ্রমিক এবং জনসাধারণ ভ্লাদিমির ইলিচকে ক্রেমলিনে বেড়াতে দেখতে পাবে।

১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটা ঝলমলে দিনে বলতিয়ান্‌স্কির ক্রেমলিনে যাবার জন্যে ফোনে ডাক পড়ল। ভ্লাদিমির ইলিচকে বলা হল ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে তাঁর বেড়াতে যেতে হবে দুপুর একটা নাগাত।

ভ্লাদিমির ইলিচ রাজি হলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে আমি ভ্লাদিমির ইলিচকে মনে করিয়ে দিলাম যে, তাঁর বেড়াতে যাবার সময় হয়েছে। তিনি চটপট উঠে টুপিটা হাতে নিয়ে বললেন:

'ওভারকোট পরব না। খাসা দিনটা আজ!'

ম্যানেজারের আপিসের কমরেডরা বলতিয়ান্‌স্কিকে ইশারা করে জানিয়ে দিলেন যে, ভ্লাদিমির ইলিচ বেরচ্ছেন। নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে লেনিন আর আমি বেরিয়ে সেই শান বাঁধানো পথটার দিকে চললাম।

---

* জারের কামান — একটা প্রাচীন বিরাট কামান, তার ওজন ৪০ টন — এটা তৈরি হয়েছিল ১৬ শতকে; রাশিয়ার কর্মকারদের দক্ষতার নিদর্শন স্মরণিক হিসেবে এটা মস্কোর ক্রেমলিনে রয়েছে।

তিনি বাড়ি থেকে বেরবার মুহূর্ত থেকে ফিরবার সময়ে তাঁর পিছনে বাড়ির দরজা বন্ধ হবার মুহূর্ত অবধি সবকিছু ক্যামেরায় ধরা হয়ে গেল।

আমরা তন্ময় হয়ে কথা বলতে বলতে চলবার সময়ে ক্যামেরাম্যানরা লেনিনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপের, তাঁর প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গির ছবি তুলে নিলেন। তাঁরা সবাই লুকিয়ে ছিলেন — কেননা, তিনি দেখতে পেলে তখনই ফিরে যেতেন।

ক্যামেরাম্যানরা যাতে ভ্লাদিমির ইলিচকে বেশ ভালভাবে দেখতে পান এবং শুধু তাঁর ছবি তুলতে পারেন সে জন্যে আমি তাঁর থেকে একটু দূরে পড়তে থাকলাম। তিনি সেটা লক্ষ্য করে বললেন:

'আপনি পিছিয়ে পড়ছেন কেন? বেড়াতে বেরিয়েছি যখন — একসঙ্গেই তো থাকা ভাল।'

আমি তাঁর কাছে গিয়ে আগের বিষয় নিয়ে কথা বলতে থাকলাম। জারের কামানের কাছে পৌঁছলে আমি আরও এগোতে বললাম, কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন:

'লোভনীয় বটে, কিন্তু যেতে পারব না। চারটের মধ্যে একটা প্রবন্ধ শেষ করতে হবে, আর দুজন কমরেডের সঙ্গে দেখা করতে হবে — তাঁদের কথা দেওয়া আছে।'

আমরা ফিরলাম। একটু এগিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন:

'দেখছেন, কে ছুটে যাচ্ছে? ওর কাঁধে ওটা কি? অ্যা, ও তো ফিল্মের লোক!'

'হ্যা, তাই। উনি ক্যামেরাম্যান। উনি ছাড়া আরও অনেক ক্যামেরাম্যানও এখানে রয়েছেন। ওঁরা আপনার ছবি তুলছেন।'

'কে তাঁদের অনুমতি দিল? আপনি আমাকে আগে জানিয়ে দেন নি কেন?'

'তার কারণ আপনি কিছুতেই রাজি হতেন না, অথচ এর খুব দরকার ছিল।'

'আপনারা আমাকে ফাঁকি দিলেন। কেন এমনটা করলেন, ভ্লাদিমির দ্মিত্রিয়েভিচ?' অনুযোগ করে তিনি বললেন।

'এই প্রথম এবং শেষ, ভ্লাদিমির ইলিচ!' এই বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি বললাম, 'শ্রমিকদের দেখাবার জন্যে এ চলচ্চিত্র আমাদের চাইই চাই। আপনি সেরে উঠছেন শুনে সবাই বড় খুশি, সবাই আপনাকে দেখতে চায় — অন্তত ফিল্মে। মাস তিনেকের মধ্যে তো আপনি সভায় বক্তৃতা করতে পারবেন না।'

'সে দেখা যাবে!'

'ডাক্তারেরা তাই বলছেন, ওদিকে শ্রমিকদের বড় আগ্রহ। তাই আমরা ঠিক করলাম বেড়াবার সময় ফিল্ম তুলে শ্রমিকদের ক্লাবে ক্লাবে দেখানো হবে। শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে এটা আবশ্যক।'

'তা, অতই আবশ্যক যদি মনে করেন — বেশ, তাহলে আর আপনার দোষ ধরছি নে।'

আমাদের পরিকল্পনাটা নিয়ে হাসি-কৌতুক করতে করতে আর চাঙ্গা হয়ে কথা বলতে বলতে আমরা ফিরলাম।

'এ তো দেখছি রীতিমতো ফিল্মের প্লট! আপনারা সত্যিই আমাকে বোকা বানিয়েছেন,' ভ্লাদিমির ইলিচ ভাল মনেই বললেন।

ক্যামেরাম্যানরা যখন দেখলেন যে, 'প্লট' ফেঁসে গেছে তখন তাঁরা লুকোবার জায়গাগুলো থেকে

বেরিয়ে এসে আমাদের কথা বলবার সময়ে প্রকাশ্যেই ফিল্ম তুললেন। আমার মনে আছে চলচ্চিত্রের এই অংশটা খুবই ভাল হয়েছিল — কেননা, তখন ভ্লাদিমির ইলিচ খুশি মনে হাসছিলেন। মোটের উপর চলচ্চিত্রখানা বেশ প্রাণবন্ত এবং আগ্রহজনকই হল।

বলতিয়ান্স্কি ভ্লাদিমির ইলিচকে ঐ ফিল্ম দেখিয়েছিলেন, জারের কামানের পাশের দৃশ্যটাই তাঁর সবচেয়ে ভাল লেগেছিল।

এই প্রাক-প্রদর্শনীর পরে 'ক্রেমলিনে ভ্লাদিমির ইলিচের ভ্রমণ' নামে চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছিল সমস্ত সিনেমায়। এই চলচ্চিত্র প্রথমে দেখানো হয়েছিল মস্কোর শ্রমিক মহল্লাগুলিতে সংবাদের অংশ হিসেবে, আর তারপরে মস্কোর এবং দেশের অন্যান্য জায়গায়। দর্শকদের আনন্দ উত্তেজনার বর্ণনা দেওয়া শক্ত। ভ্লাদিমির ইলিচ পর্দায় ফুটে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিত, আর স্লোগান তুলত:

'ভ্লাদিমির ইলিচ জিন্দাবাদ!'

আ. কনোনভ

কাশিনো গ্রামে

১৯২০ সালে কাশিনো গ্রামের বাসিন্দারা একটা ছোট বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করল। তখন দিন-কাল ছিল কঠিন: নির্মাণের অত্যাবশ্যক মালমসলাও পাওয়া যেত না।

তবু, কাশিনো গ্রামের কৃষকেরা নিজেদের ইচ্ছামতো বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়তে লেগে গেল। প্রথমে তারা বহু কষ্টে কয়েক বাণ্ডিল টেলিফোনের তার যোগাড় করে ফেলল। নিয়মিত তার থেকে তৈরি বলে ঐ তার ছিল খুব মোটা। চিমটা দিয়ে, সাঁড়াশি দিয়ে, খালি-হাতে তারা তারের জড়ান খুলে ফেলল। তারা দেখল তাদের তার হয়েছে অনেক।

খুঁটির জন্যে বন থেকে সব গুঁড়ি নিয়ে এল পরদিন। তারপর চাই বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপাদনের ডাইনামো।

তখন একটা মামুলী পেরেক কিনতে পাওয়াও প্রায় অসম্ভব ছিল—কাজেই, ডাইনামো পাওয়া যে কী ব্যাপার সেটা বোঝাই যায়!

কাশিনো থেকে কৃষক প্রতিনিধিদল গেল মস্কোয়। ডাইনামোর খোঁজে যেখানেই তারা গেল সেখানে তারা প্রথমেই বলল যে, দেশের সব জায়গায় বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়া সম্বন্ধে লেনিনের পরিকল্পনার কথা তারা পড়েছে — সেই পরিকল্পনা অনুসারেই তারা কাজে লেগেছে।

বহু চেষ্টা করে তারা শেষে একটা ডাইনামো পেয়ে গেল।

কাশিনোয় ফিরে তারা একটা বড় গোলাবাড়িতে ডাইনামোটা বসাল।

তারপরে রাস্তা বরাবর সব খুঁটি পুঁতে সেগুলোতে তার খাটিয়ে দিল। প্রত্যেকটি পরিবারকে একটা করে ইলেকট্রিক বাল্‌ব্ দেওয়া হল।

সবকিছু তৈরি হয়ে গেলে তারা লেনিনের কাছে চিঠি লিখল — তিনি যেন বিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন।

লেনিন সময় করে সত্যিই আসতে পারবেন, এমনটা কেউ ভাবেও নি। তবু, উদ্বোধন অনুষ্ঠানের জন্যে প্রস্তুতি চলল। গ্রামের সবচেয়ে বড় বাড়িটায় নিয়ে এল যেখানে যত আসবাব ছিল—পাতলা লম্বা লম্বা টেবিল আর বেঞ্চ। প্রত্যেক বাড়ির গিন্নি রান্নাবান্না করল, নানারকমের রুটি তৈরি করল এই অনুষ্ঠানের জন্যে।

১৪ই নভেম্বর উদ্বোধন দিবস। লেনিন আসবেন বলে আশা করা যায় কিনা, সেটা কৃষকেরা ভেবে উঠতে পারছিল না।

হঠাৎ রাস্তার ও মাথায় একখানা মোটরগাড়ি দেখা গেল। বাচ্চারা সব ছুটে গেল। গাড়িখানা থামল। ভিতরে বসে ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ এবং নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্‌না।

‘কোথায় তোমাদের বিদ্যুৎকেন্দ্র?’ বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করলেন ভ্লাদিমির ইলিচ।

‘গাড়িতে যদি আমাদের তুলে নাও তাহলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।’

লেনিন তাদের গাড়িতে উঠতে বললেন। তখন গাড়ি চলল সবাইকে নিয়ে। তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার জন্যে অনেক কৃষক অপেক্ষা করছিল বড় বাড়িটার সামনে। সবাই ভিতরে ঢুকলেন — সেখানে বসে কথাবার্তা চলল।

শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে লাল ফৌজের জয়ের কথা বললেন লেনিন। তিনি কৃষকদের সাফল্যে অভিনন্দন জানালেন। কৃষকেরা বললেন সব নিজেদের বিষয়।

লেনিন সব শুনলেন খুব মন দিয়ে। কৃষকেরা থামলেই তিনি বলেন:

‘তারপর?’

লেনিনের স্মরণশক্তি ছিল আশ্চর্য। বহু নাম তাঁর মনে থাকত, তিনি কৃষকদের পুরো নাম ধরে সম্বোধন করছিলেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাতে বড় খুশি।

লেনিনেরও আর কৃষকদেরও এইসব কথাবার্তা খুব ভাল লাগছিল — কখন যে সন্ধ্যে হয়ে এল কেউ টেরই পান নি। এতে মেজাজ বিগড়ে গেল শুধু ফোটোগ্রাফারের। সে এই গ্রামে এসেছিল ভ্লাদিমির ইলিচ এবং কৃষকদের ফোটো তুলবার জন্যে, কিন্তু ভাল ফোটোর জন্যে যথেষ্ট আলো পাওয়া যাবে না বলে তার দুশ্চিন্তা।.

শেষে সে সাহস করে বলে ফেলল:

‘ভ্লাদিমির ইলিচ, সবাই আপনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে ফোটো তোলাতে চায়।’

‘ও, তা বেশ...’ এই বলে তিনি কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতেই থাকলেন।

গেল আরও দশ মিনিট। অন্ধকার হয়ে আসছিল। তখন ফোটোগ্রাফার মরিয়া হয়ে বলল:

‘আর কয়েক মিনিট দেরি হলে আর ছবি তোলা যাবে না!’

ভ্লাদিমির ইলিচ ফোটো তোলানো পছন্দ করতেন না — তবে, অন্যের কাজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। যাই হোক, ফোটোগ্রাফার বিশেষভাবে এই ঘটনা উপলক্ষেই শহর থেকে এসেছিল।

লেনিন বললেন:

‘ঠিক আছে। সব ঠিকঠাক করে নিন। নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্না আর আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি।’

ফোটোগ্রাফার ছুটে বাইরে গিয়ে ক্যামেরা সাজাতে থাকল। বহু বাচ্চা এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তারা সবাই বসতে চায় সামনের সারিতে ক্যামেরার শাটারের কয়েক ইঞ্চির মধ্যে।

ভ্লাদিমির ইলিচ আর নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্না বেরিয়ে এলেন। ফোটোগ্রাফার তাঁদের জায়গা করলেন কৃষকদের মাঝখানে। কিন্তু তখনও বাচ্চাদের বাধা পড়ছিল। তারা প্রত্যেকেই বসতে চায় লেনিনের পাশে। ফোটোগ্রাফার রেগে বাচ্চাদের বলল তারা চুপচাপ না বসলে কোন ছবি হবে না। তাদের শান্ত হয়ে বসবার জন্যে ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন:

‘সবাই ঐ ছোট্ট কালো ফুটোটার দিকে তাকিয়ে থাকো।’

বাচ্চারা ছোট্ট কালো ফুটোটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ফোটোগ্রাফার অদৃশ্য হল একখানা লম্বা কালো কাপড়ের নিচে — সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

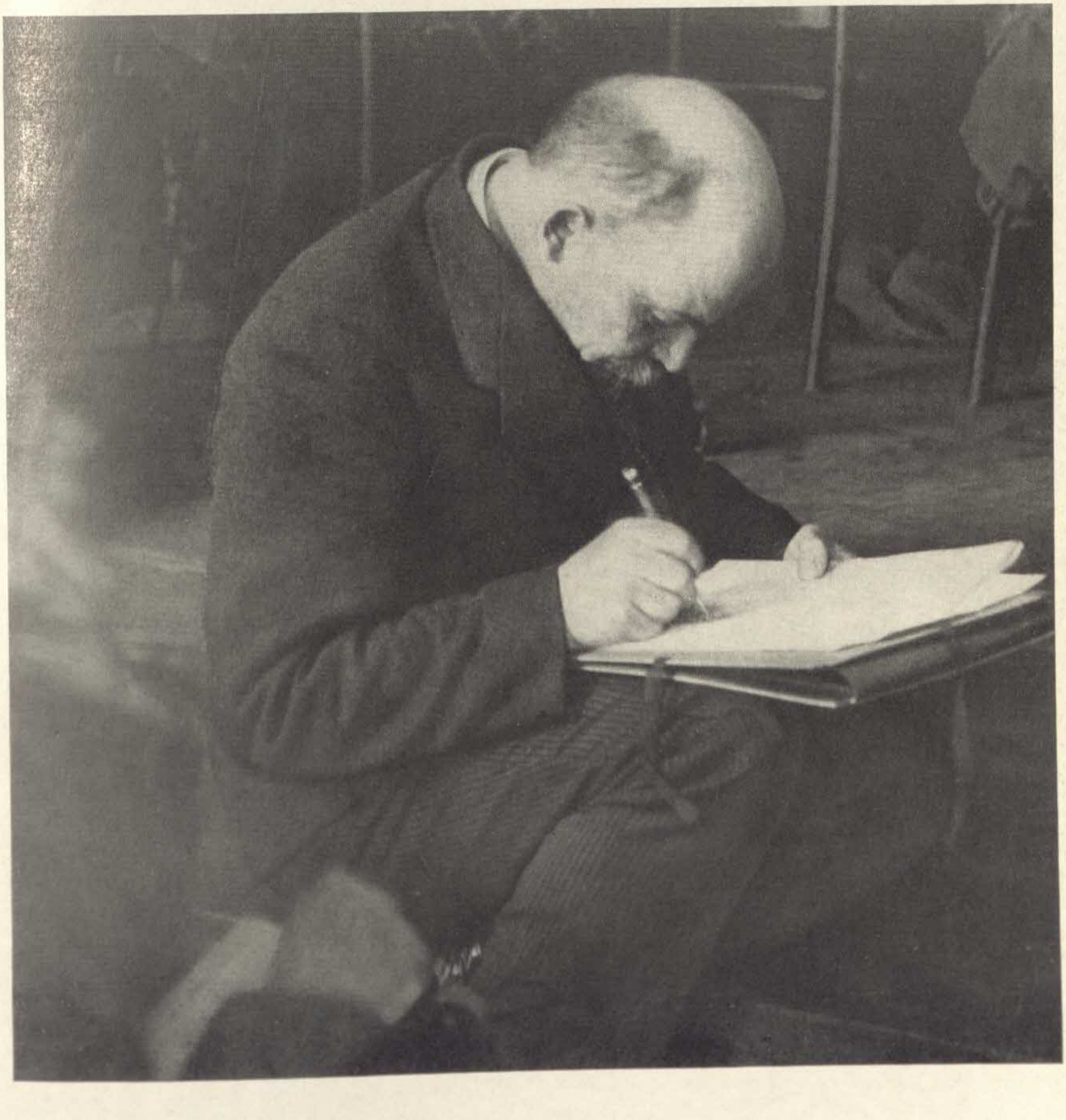
কাশিনো গ্রামের কৃষকেরা তৈরি করেছিল নিজেদের ছোট্ট বিদ্যুৎকেন্দ্র। সেই বিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ এবং নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্না। ফোটোতে থাকবার জন্যে বড় ইচ্ছে হয়েছিল গ্রামের বাচ্চাদের।



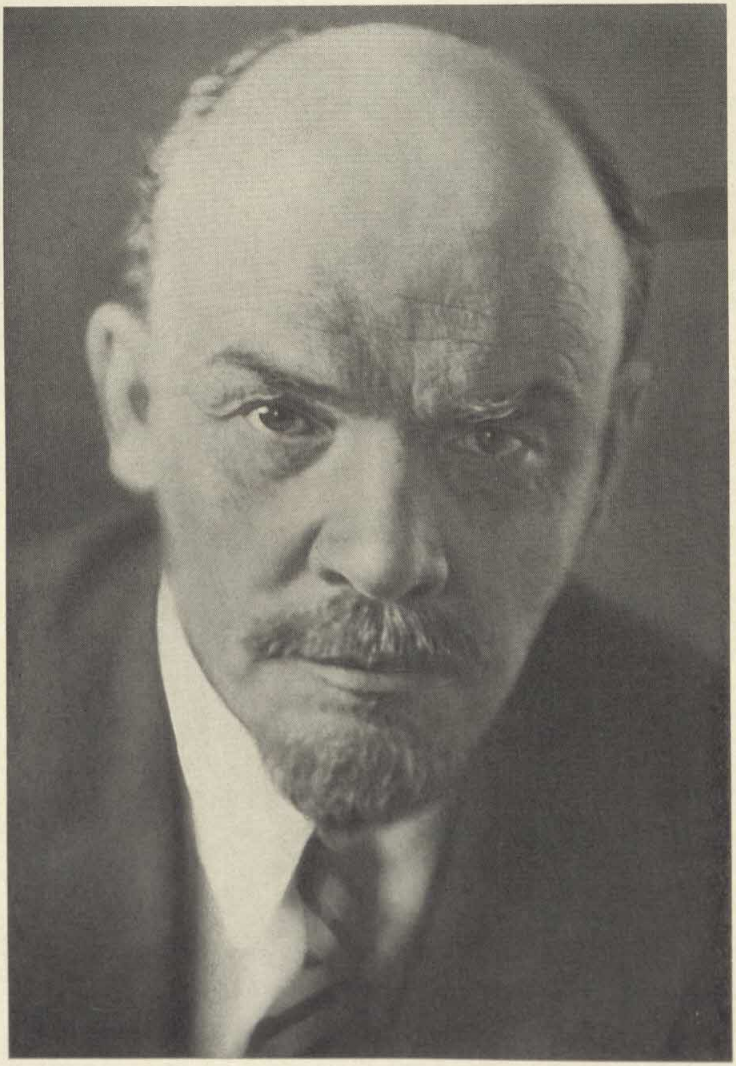
জাতিতে-জাতিতে মৈত্রী ছিল লেনিনের একটা প্রধান আগ্রহের বিষয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলীতে ভ্লাদিমির ইলিচ।



মনোনিবেশ করা যায় যেকোন অবস্থায় — এমন কি, সভা চলবার সময়ে মঞ্চের সিঁড়িতেও



লেনিনের সেরা ফোটোগ্রুলির একখানা



লেনিন বললেন:

'বাচ্চাদের যে ঠান্ডা লাগবে।'

সবাই হেসে উঠল।

'কিছু হবে না — এরা সবাই শক্ত-সমর্থ, তাকতদার।'

বড়োরা তাদের সম্বন্ধে কথা বলছে বলে বাচ্চারা এদিক-ওদিক ঘাড় ফেরাতে আরম্ভ করল। ফোটোগ্রাফার চেঁচিয়ে বলল:

'সব চুপচাপ করে বসো!'

সব দেখে লেনিন হাসলেন — আর সেই মুহূর্তে ফোটোগ্রাফার শাটার টিপল।

তারপরে সভা হল। জায়গাটার মাঝখানে একটা লম্বা খুঁটি। এই খুঁটি থেকে একটা বিজলী বাতি ঝুলছিল — সেখানে সবাই জড়ো হল। খুঁটিটার পাশে একখানা টেবিল — সেটা ফারগাছের ডাল আর লাল ফিতে দিয়ে সাজানো।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে অন্যান্য গ্রাম থেকেও কৃষকেরা কাশিনোয় এসেছিল। অনেক দূর দূর জায়গা থেকেও এসেছিল অনেকে।

লেনিন টেবিলের কাছে গিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন।

'কাশিনো গ্রাম আজ একটা বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু করছে। কাজটা বড় চমৎকার — তবে, এটা সবে শুরু! আমাদের সমগ্র প্রজাতন্ত্রে যাতে বিদ্যুতের বন্যা এসে যায়, তারই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।'

লেনিনের বক্তৃতা শেষ হলে তারের বাদ্যযন্ত্রের একটা বাজিয়ে দল 'আন্তর্জাতিক' সংগীতের সুর বাজাতে থাকল। সেই মুহূর্তে বিজলী কারিগর গোলাবাড়িতে যেখানে ডাইনামো ছিল সেখানে সুইচ টিপে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালু করে দিল।

চত্বরে বিজলী বাতি জ্বলে উঠল। প্রত্যেকটি বাড়িতে জ্বলে উঠল বিজলী বাতি।

এর আগে কাশিনোর কৃষকদের ঘরে জ্বলত কাঁপা-কাঁপা তেলের বাতি—তার মিটমিটে আলো ছিল সবুজাভ। এখন জ্বলজ্বলে বিজলী বাতির দিকে তাকিয়ে একজন বলে উঠল:

'এবার জ্বলল ইলিচের আলো।'

লেনিন এবং নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্না কৃষকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে ফিরে চললেন। নভেম্বর মাসের সেই ঠান্ডা, অন্ধকার সন্ধ্যাটায় ছিল হাওয়ার দাপট।

সেই গ্রাম থেকে কিছু দূর গিয়ে ওঁরা একবার ফিরে তাকালেন। সেখানে সেই অন্ধকার মাঠগুলোর ভিতরে দেখা গেল কাশিনো গ্রামের বাড়িগুলোর আলোকিত জানালাগুলো।

স. আন্তোনভ

ক্রেমলিনে সাক্ষাৎকার

লেনিন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন — তাঁর হাত দুখানা প্যান্টের পকেটে ঢুকানো। উঁচু খিলানওয়ালা তাঁর আপিস-ঘরে দুটো উঁচু জানালা; কামরাটা ঠান্ডা আর সেঁতসেঁতে। শীতের শেষ সপ্তাহগুলোয় ঠান্ডা বড় বেশি।

ভ্লাদিমির ইলিচ জানালা দিয়ে অস্ত্রাগারের বাড়িটা দেখতে পাচ্ছিলেন; গোলাগুলির টুকরো বিঁধে বিঁধে বাড়িটার গা ক্ষতবিক্ষত। ত্রইৎস্কায়া মিনারের খোদাই-করা ঈগলটা ধূসর আকাশের পটভূমিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; গম্বুজটাকে এই অবস্থান থেকে যা মনে হয় তার চেয়ে বেশি উঁচু মনে হয় মানেঝ স্কোয়ার থেকে। দেখা যাচ্ছিল ক্রেমলিন প্রাকারের একাংশ আর ব্যারাকগুলো। চত্বরে জায়গায় জায়গায় খোয়াগুলো বসে গিয়ে গর্ত হয়েছে। অস্ত্রাগারের গা বরাবর নিকোল্‌স্কায়া মিনারের দিকে চলে গেছে এক সারি রাস্তার আলো — সেগুলোকে মনে হয় যেন এক এক ফলা সবুজ ঘাস, তার প্রত্যেকটার প্রান্তে যেন এক একটা বঁড়শি।

ত্রইৎস্কায়া মিনার থেকে অস্ত্রাগার অবধি রেড স্কোয়ারের বরফ কালচে আর নোংরা। বাড়ির ছাদগুলোয় আর ক্রেমলিন প্রাকারের উপরে বরফ কিন্তু দুধের মতো শাদা।

ক্রেমলিনের ওধারে পাথরের বাড়িগুলো যেন বরফে জমাট বেঁধে গেছে। মিউজিয়ম আর রুম্যানৎসেভের নামে গ্রন্থাগারের ওধারে ধূমনালীগুলো লেনিন দেখতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু তার কোনটা দিয়ে লেশমাত্রও ধোঁয়া বেরয় না: নগরীতে জ্বালানি নেই।

শীতের হিম-শীতল কবলে পড়েছে মস্কো। গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়ে রক্তাক্ত, জর্জরিত দেশে ভুখা আর ধ্বংসের সঙ্গে মিলেছে নিদারুণ ঠান্ডা।

টাইফাসের যেন রাজত্ব চলেছে।

লেনিন একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হঠাৎ পকেট থেকে ডান হাত বের করে তিনি নিশ্চিত পদক্ষেপে গেলেন ডেস্কের দিকে।

একটা মামুলী কলম ছুটতে থাকল কাগজের উপর দিয়ে, অনেক শব্দ শেষ হল না, আরও অনেক শব্দ লেখা হল সংক্ষিপ্তরূপে — অন্যে তার কিছুই বুঝতে পারবে না। ভাব-ভাবনা ভিড় করে আসছিল তাঁর মাথায় — সেগুলো সব টুকে রাখা দরকার। শিশুভবনগুলোয় খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে সেখানে যথেষ্ট জ্বালানি আছে কিনা। সেখানে জ্বালানির ব্যবস্থা করতে হবেই... ধাতু শিল্পে সমস্ত শ্রমিকের রেশনে চিনি স্যাকারিনের পরিমাণ বাড়ানো দরকার... গ্রামাঞ্চলের জন্যে বই প্রকাশ করবার কাজে শিক্ষার জন-কমিসারিয়েত পিছিয়ে পড়ে গেছে... ডিক্রিটাকে সব কমরেডকে পড়ানো দরকার — ওটা গৃহীত হওয়া চাই... কামেনেভের কাছে চিঠা পাঠাতে হবে... বৈদেশিক শিল্পপতিরা এসে লাভের জন্য কাজ করতে চাইছে... রাশিয়া নিজেই পারবে, কি না?..

মুহূর্তের জন্যে কলমটা উঁচু হয়ে রইল।

সম্মেলন-হলে যাবার শাদা অয়েলক্লথ-লাগানো দরজাটা আস্তে খুলে গেল — সচিব মাথা বাড়িয়ে খাটো গলায় ডাকল:

'ভ্লাদিমির ইলিচ!'

লেনিন জবাব দিলেন না — তিনি কাজে তন্ময় হয়ে ছিলেন।

'ভ্লাদিমির ইলিচ...'

'হ্যাঁ, শুনছি,' লেনিন মাথা তুলে কথাটা বলে চিঠা লিখবার জন্যে আর একখানা কাগজ তুলে নিলেন।

'কমরেড কোর্‌শুনভ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

'ঠিক আছে।'

আস্তে দরজা বন্ধ করে সচিব চলে গেল। ভ্লাদিমির ইলিচ লিখে চললেন। কামেনেভের কাছে চিঠাখানা লিখে ফেলা দরকার।

রোগা, বেঁটে-খাটো বিজ্ঞানী দরজা দিয়ে ঢুকতেই লেনিন উঠে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। তাঁর পুরন পরিচিত মানুষটিকে যেন একটু অপ্রতিভ আর আড়ষ্ট মনে হল।

'আসুন, লিওনিদ্‌ আলেক্সেয়েভিচ,' একখানা আর্মচেয়ার দেখিয়ে লেনিন বললেন, 'বসুন, বসুন।'

কোর্‌শুনভ আর্মচেয়ারখানার কাছে তাড়াতাড়ি গিয়ে কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে টেবিলের নিচে পা লুকিয়ে বসে পড়লেন।

লেনিন জিজ্ঞাসা করলেন:

'কেমন আছেন? স্বাস্থ্য ভাল তো?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ, ভাল আছি।'

'বেশ। দিন-কাল বড় খারাপ। এসব অতিক্রম করে চলতে হবে আমাদের।'

'ভ্লাদিমির ইলিচ, সাইবেরিয়ায় একটা আবিষ্কার অভিযাত্রীদল পাঠানোর বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে এসেছি। জানেন তো, ১৯০৮ সালের ৩০এ জুলাই তারিখে সাইবেরিয়ার তাইগা অঞ্চলে একটা উল্কা পড়েছিল। এটা খুবই বিরল ঘটনা — বিশেষত উল্কাটার অসাধারণ আকারটা। বৈজ্ঞানিক জগতে এটা বিশেষ আগ্রহের বিষয়।'

কোর্‌শুনভের মনে হচ্ছিল লেনিনের মহা মূল্যবান সময়ের বড় বেশি তিনি নিয়ে নিচ্ছিলেন— কেননা, লেনিন উল্কার বিষয়ে সবকিছু জানেন, কেন এসেছেন বিজ্ঞানী সেটা তিনি নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছেন। তাই কোর্‌শুনভ একটু থামলেন। কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিচ মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনছিলেন।

'বলুন, বলুন,' লেনিন বললেন, 'খবরের কাগজ থেকে মামুলী ঘটনাটা শুধু জানি। আমরা যারা সরকারে আছি তাদের যত বেশি সম্ভব তথ্য জানা দরকার।'

'পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় উল্কার ওজন সাড়ে ছত্রিশ টন। তার পরের যাকে বলা হয় মেক্সিকোর

উল্কা — সেটার ওজন সাতাশ টন। তাদের সঙ্গে তুলনায় সাইবেরিয়ার উল্কাটা সত্যিই বিশাল। দুঃখের কথা, উল্কাটা ঠিক কোথায় পড়েছিল সেটা কখনও নিরূপণ করা হয় নি।'

'তাই আপনারা গিয়ে সেটার খোঁজ করতে চান?'

'তাই। এই রকমের আবিষ্কার অভিযানের সময় এটা নয়, তা আমি বুঝি। কিন্তু আমি চাইব অল্পই। আমি মনে কষ্ট পাচ্ছি যে, আমাদের উল্কা নিয়ে গবেষণা চালাবার জন্যে বিদেশে বিভিন্ন সমিতি গড়া হচ্ছে, আর আমরা...'

লেনিন চটপট বললেন:

'না, এ নিয়ে বৈদেশিক সমিতিগুলির মাথা ঘামাবার কিছু নেই। তারা অকারণে সময় নষ্ট করছে। আপনার এই আবিষ্কার অভিযানের জন্যে কি দরকার বলুন।'

পকেট থেকে কয়েকখানা ভাঁজ-করা কাগজ বের করতে করতে কোরশুনভ বললেন:

'সব এখানে লিখে রেখেছি। শুধু যা অত্যাবশ্যক সেগুলো ছাড়া আর সবই আমি বাদ দিয়েছি।'

লেনিন ফর্দটা পড়তে আরম্ভ করলেন। পড়তে পড়তে তাঁর ভ্রূকুটি বেড়ে যেতে থাকল। শেষে, কাগজ ক'খানা ডেস্কে রেখে বাঁ হাত দিয়ে কাগজগুলো সমান করতে করতে তিনি বিজ্ঞানীর দিকে তাকালেন। কঠোরতা এবং বেদনা দুইই তখন ফুটে উঠল তাঁর চোখে-মুখে।

কোর্শুনভ লেনিনের দিকে তাকিয়ে অনিশ্চিতভাবে বললেন:

'তা, আরও কিছু কমাতে পারি। অত রুটি দরকার হবে না। কোন কোন যন্ত্রও বাদ দেওয়া যেতে পারে... বাদ দেওয়া যায় একটা থিওডোলাইট, তাছাড়া...'

লেনিন তাঁর ওধারে কামরার একটা কোণের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কামরায় অন্য কেউ রয়েছেন সে হুঁশই যেন তাঁর ছিল না। চোখ কুঁচকে বিজ্ঞানীর দিকে তাকিয়ে লেনিন কথাটার পুনরুক্তি করলেন:

'একটা থিওডোলাইট বাদ দিতে পারেন।' এই বলে নিজের বেতের চেয়ারখানা পিছনে ঠেলে কাগজের উপর বিরক্তিসূচক টোকা মারতে মারতে উঠে দাঁড়ালেন।

আবার পকেটে দু' হাত ঢুকিয়ে তিনি পায়চারি করতে থাকলেন। কোর্শুনভের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি বারবার জানালার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

'আপনারা যাচ্ছেন জনমানবহীন অঞ্চলে তাইগার ভিতরে,' লেনিন কঠোর স্বরে বলছিলেন, যেন ভবিষ্যতে কি হবে সেটা এই বিজ্ঞানীকে বুঝিতে দিতে চান। 'সেখানে রয়েছে হাজার হাজার মাইল ধরে অক্ষত বনভূমি, নদীপ্রপাত, আছে নানা বুনো জন্তুজানোয়ার, রাস্তা-ঘাট নেই, শত শত মাইলের মধ্যে জন-প্রাণীর দেখা পাওয়া যায় না। এটা কি বুঝতে পারছেন না?'

লেনিন থামলেন।

'না, আপনি অবশ্য এসব খুব ভালভাবেই জানেন,' এবার তিনি একটু নরম গলায় বলতে বলতে কাগজখানা তুলে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে থাকলেন, 'মাথাপিছু দৈনিক এক পাউণ্ড রুটি, গোটা অভিযানের জন্যে পাঁচ পাউণ্ড চিনি, তামাক...' তার গলার স্বরে কখনও রুক্ষতা, কখনও রুষ্টতা, কখনও বিস্ময়, আর কখনও হঠাৎ ভীষণ বিষণ্ণতা।

কোর্‌শুনভ আপত্তি জানিয়ে বললেন:

'চিনিটা কমানো যেতে পারে, কিন্তু তামাকটা দরকার — মশার বিরুদ্ধে ওটাই একমাত্র সহায়।'

তাঁর কথায় যেন কোন বাধা পড়ে নি, তেমনিভাবে ভ্লাদিমির ইলিচ বলতে থাকলেন:

'যন্ত্রপাতির বাক্সের জন্যে ফারের আস্তরণ। যন্ত্রপাতির বাক্সের জন্যে!' শেষ কথাটা বললেন দু'বার।

কোর্‌শুনভ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চশমার কাচ চকচক করছিল — তাতে জানালা প্রতিফলিত হচ্ছিল। তাঁর চোখে সংকল্প ফুটে উঠেছিল — তিনি যেন শেষ চেষ্টা করে দেখতে চান।

'ভ্লাদিমির ইলিচ!' বিজ্ঞানী বললেন জোরে জোরে, দৃঢ় স্বরে, 'কমরেড লেনিন! আমাদের যেতে হবেই! আপনি দেখতে পাচ্ছেন না আমাদের কী সৌভাগ্য? উল্কাটা পড়েছে আমাদের দেশের মাটিতে—অন্য কোন দেশে নয়। মহাজগৎ থেকে এ বড় বিরল আগন্তুক! আর, আমরা?.. এটা যদি পড়ত ফ্রান্সে কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, তাহলে ইতোমধ্যে কত যে বৈজ্ঞানিক অভিযান চলত সেখানে! ঠিক বটে, আমাদের দেশে মানুষের পরার কাপড় নেই, খাবার নেই, চারদিক থেকে বৈদেশিক আক্রমণকারীরা আমাদের গলা টিপে মারতে চাইছে — তবু, যে সুযোগ আমাদের এসেছে, সেটা বুঝে আমরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারব না? আমরা দারিদ্র্যক্লিষ্ট — সে জন্যে তো পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের দোষ দেওয়া যায় না। ভ্লাদিমির ইলিচ, আমাদের যেতেই হবে — তা ছাড়া উপায় নেই।'

কোর্‌শুনভ আবার আর্মচেয়ারে বসলেন।

'হা ভগবান!' এই কথা বলে উঠে লেনিন বিজ্ঞানীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'যাবেন, যাবেন তো নিশ্চয়ই! যা চেয়েছেন সবই দেওয়া হবে। কিন্তু এ তো যা দরকার তার কাছাকাছিও নয়! সাইবেরিয়ায় বৈজ্ঞানিক অভিযানের জন্যে ঐ হল সাজসজ্জা? আপনি এই ফর্দে যা লিখেছেন সেটা বড়জোর মস্কোর শহরতলিতে যাবার উপযোগী! এ যে একবারে কিছুই না! কী নিদারুণ অবস্থা! কী নিদারুণ অবস্থা যে, আপনাদের যা দরকার, যা ন্যায্য সেসব আমরা দিতে পারি নে! কিন্তু আমাদের সুদিন আসবে — একটু সময় দিন, দেখবেন!'

কোর্‌শুনভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে কপালের ঘাম মুছলেন।

'অতি দীনহীন এই ফর্দে আপনি নিম্নতম যার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন সেটা দেওয়া হলে চলবে? তাহলে যেতে পারবেন আপনারা?'

'এর বেশি আমি আশাই করতে পারি নে, ভ্লাদিমির ইলিচ! বরফ গললেই আমরা সবকিছু প্রস্তুত করে বেরিয়ে পড়ব। বিশ্বাস করুন আমার কথা — অন্য কিছুই আমাদের দরকার নেই। আপনার কাছে সবাই আসছেন কত অনুরোধ নিয়ে — কিন্তু যা দরকার সেই সবকিছু আপনি পাবেন কোথায়?'

'তাহলে আপনি বেরিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত?' লেনিন আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ।'

'অন্য কিছুই দরকার নেই?'

‘না।’

‘একবারে কিছুই না?’

‘একবারে কিছুই নয়।’

লেনিন একটু কাশলেন। মনে হল যেন তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। তারপর টেবিলের নিচে তাকিয়ে তাঁর ঠোঁটে একটু হাসি ফুটল।

তিনি খুশি-খুশি স্বরে বললেন:

‘আচ্ছা, বন্ধুবর, একবারটি আসুন তো ঐ জানালাটার কাছে।’

‘কিসের জন্যে?’

‘আমি অনুরোধ করছি — একবারটি আসুন ঐ জানালাটার কাছে।’

‘ভ্লাদিমির ইলিচ, আপনি যদি ঐ ফর্দে রাজি থাকেন তাহলে আপনার সময় আর নেবার কোন অর্থ হয় না।’

‘তাহলে আমি রাজি নই,’ লেনিন আস্তে বললেন, ‘আপনি অনুগ্রহ করে একবারটি আসবেন এখানে?’

কোর্শুনভ ইতস্তত করে উঠে গেলেন।

ভ্লাদিমির ইলিচ বিজ্ঞানীর পায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন:

‘হ্যাঁ। ঠিক যা ভেবেছিলাম। এই ছেঁড়া জুতো পরে বৈজ্ঞানিক অভিযানে যেতে পারেন বলে আপনি সত্যিই আশা করেন? আপনি মস্কো থেকে মাইল পাঁচেক যেতে না যেতেই ও জুতো খসে পড়ে যাবে।’

‘না, খুব খারাপ নয়। এখনও দড়ি বেঁধে ঠিক করে নেওয়া চলবে।’

‘হ্যাঁ, তা করা যায় বটে!’ ভাবতে ভাবতে লেনিন বললেন, ‘এই এক জোড়াই তো আছে বোধহয়?’

‘ঠিক।’

‘কথাটা তুললাম বলে কিছু মনে করবেন না’, এই বলে লেনিন হাতের ইশারায় কোরশুনভকে আবার বসতে বললেন। তারপর তিনি প্রখর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বুঝে নিলেন বিজ্ঞানী অসন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা। বিজ্ঞানী অসন্তুষ্ট হন নি বুঝে লেনিন আবার পায়চারি করতে থাকলেন। তিনি বললেন:

‘অতি চমৎকার সব মানুষ রয়েছেন আমাদের দেশে। ধরুন ৎসিওলকভস্কি। একবারটি ভাবুন — রাশিয়ার একটা মফস্বল শহরে এক বৃদ্ধ গণিতের শিক্ষক থাকেন একটা পুরন কাঠের বাড়িতে, যে রাস্তায় সেই বাড়িটা সেটা ঘাসে ছেয়ে গেছে — সেখানে চরে বেড়ায় হাঁস, মুরগী আর শুয়োর। রুটি আর হেরিং মাছের সামান্য রেশনে তাঁর দিন কাটাতে হয়, আর মানুষের গ্রহান্তরযাত্রার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তিনি কাজ করেন। জ্বালানির অভাবে সে-বাড়িতে তাপের কোন ব্যবস্থা নেই, সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত! আর এই আপনি — আপনিও ঐ একই ধাতের মানুষ। আপনি চলেছেন সাইবেরিয়ার জনমানবহীন এলাকায় — হাজার হাজার মাইলের পথ, কিন্তু পায়ে এক জোড়া মাত্র ছেঁড়া জুতো!’

'আর, আপনি নিজে?' কোর্‌শুনভ ভাবছিলেন, 'আপনিও তো সেই একই রকম। এই তো আপনি যে দেশে সমাজতন্ত্র গড়ছেন সেখানে অনেকেই ঐ শব্দটা পড়তেও পারে না!'

হঠাৎ তাঁর মনে হল — তিনি আর লেনিন একই সূত্রে বাঁধা, তারা দুজনেই কাজ করছেন একই লক্ষ্য সাধনের জন্যে; বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ভেদ করবার জন্যে কালুগা শহরে কাজে তন্ময় ৎসিওলকভস্কির জীবনের পিছনে চালিকাশক্তিও ঐ একই লক্ষ্য, যুদ্ধে বিধ্বস্ত কলকারখানা নতুন করে গড়ে তুলছে ভুখা শ্রমিক — তাদেরও ঐ একই চালিকাশক্তি; ঐ একই চালিকাশক্তিতে কৃষক চাষাবাদ করছে কাঠের লাঙল দিয়ে।

কোর্‌শুনভ যখন চলে গেলেন তখন তিনি উত্তেজনা বোধ করলেন; তাঁর চোখ দুটো তখন জ্বলজ্বল করছিল। ক্রেমলিন থেকে বেরিয়ে তিনি রেড স্কোয়ার পার হলেন হনহনিয়ে। তিনি ভাবছিলেন আগামী দিনের কথা। স্বপ্ন সার্থক হবেই — সেই কথা তিনি ভাবছিলেন। ১৩১

...নতুন কারখানার ধূমনালীগুলো দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বেরবে সেদিন আসবে। যেসব কলকারখানা এখনও তৈরি হয় নি — খিলানওয়ালা ছাদ-দেওয়া ছোট্ট ঠাণ্ডা আপিস-ঘরে বসে কর্মব্যস্ত মানুষটির স্বপ্নেই রয়েছে যেসব ট্র্যাক্টর কারখানা আর মোটরগাড়ির কারখানা — সেগুলির ধূমনালীগুলো দিয়েও কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া বেরবে। পুশকিন আর তলস্তয়ের সব বই আসবে ঘরে ঘরে — কেননা, অজ্ঞ, অর্ধ-বন্য রাশিয়া হবে সমস্ত সাক্ষরের দেশ... আর স্বভাবতই, বৈজ্ঞানিক অভিযান পরিচালিত হবে উত্তর মেরুতেও। কেউ হয়ত পেঁছে যাবে মহাসাগরের তলদেশে, আবার কেউ বা পাড়ি জমাবে পৃথিবীর আবহমণ্ডল ছাড়িয়ে আরও অনেক অনেক দূরে। আর সেই সব বৈজ্ঞানিক অভিযানের নেতাদের মহান নবীন রাষ্ট্রের সংগঠককে বিরক্ত করতে হবে না একটুকরো রুটি আর একমুঠো তামাকের আবেদন নিয়ে... দেশে তখন মানুষ হবে এক নতুন জাতের; পৃথিবীতে মানুষের স্থান সম্বন্ধে তাঁদের উপলব্ধি হবে নতুন ধরনের। এইসবই একদিন হবে।

কিন্তু এখন রাস্তায় গাদা-গাদা বরফ, এখন পথচারীর গায়ে পড়ছে ঠাণ্ডা হাওয়ার চাবুক, হাড্ডিসার একটা ঘোড়া একখানা গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দোকানপাটের ঝাপ নমানো, তালা বন্ধ, সেগুলোর মরচে-ধরা সাইনবোর্ডে লেখা: 'গুরিন অ্যাণ্ড সন্স, পাইকার', 'ই.ভ. কোশ্‌কিন, লোহালক্কড়-বিক্রেতা'। এখন এই।

...লাল ফৌজের একদল সৈনিক চলছে, স্লেজে করে এক বোঝা লোহার পাইপ টেনে নিয়ে গেল। ওরা নতুন একটা কিছু তৈরি করছে কিংবা মেরামত করছে। একটা আপিসের জানালা দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন ভিতরে কার্ল মার্কসের প্রতিকৃতি, আর তার নিচে পতাকায় লেখা: '...জিন্দাবাদ!' একটা বাড়ি থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল — তার মাথায় বাঁধা লাল রুমাল।

এই মহান দেশের মর্মকেন্দ্র ক্রেমলিনে আপিস-ঘরে পায়চারি করছেন লম্বায় গড় মাপের গাঁট্টাগোট্টা মানুষটি। খুব তাড়াতাড়ি তিনি লিখে যাচ্ছেন ভাবভাবনাগুলো। যেসব নতুন বিরাট সাফল্য আসছে — যেসব সাফল্য রাশিয়ার চেহারাটাকেই পাল্টে দেবে — সেই বাস্তব, অনুপ্রেরণাময় সাফল্যগুলিকে তিনি আগেভাগে দেখে নির্ধারণ করতে পারেন।

স. আলেক্সেয়েভ

গোপন অনুরোধ

অনেক শ্রমিক কৃষক ভ্লাদিমির ইলিচকে উপহার পাঠাতেন। তখন দেশে খাদ্যের অনটন ছিল— লোকে তাঁকে দিত রুটি, শস্য, চিনি। উপহার আসত আরও নানা রকমের। চামড়া-পাকা-করা কারখানার শ্রমিকেরা পাঠিয়েছিল একটা ভেড়ার চামড়ার কোট। ভলোগদার লেস-প্রস্তুতকারকেরা তাঁর জন্যে একটি সুন্দর বিছানা-ঢাকা পাঠিয়েছিল। পেত্রগ্রাদের কাপড়ের কারখানার শ্রমিকেরা পাঠিয়েছিল একটা গরম কম্বল।

যখনই এই রকমের কোন উপহার আসত লেনিন রেগে যেতেন।

তাঁর কমরেড এবং সহকর্মীরা বলতেন:

'কেন, ভ্লাদিমির ইলিচ, রাগ করবার কিছু নেই — লোকে জিনিস পাঠায় তাদের অন্তরের অন্তস্তল থেকে।'

'হ্যাঁ, তা বুঝি। তবু, এটা ঠিক নয়। এসবের মূল রয়েছে ইতিহাসে। পুরন আমলে জমিদার আর পাদরি-পুরুতেরা উপহার চাইত। এটা এখন বন্ধ করানো দরকার।' কথাটায় আরও জোর দিয়ে তিনি আবার বললেন, 'এর অবসান ঘটাবার সময় হয়ে গেছে।'

একবার গোমেল অঞ্চলের ক্লিন্‌ৎসি শহরের স্তদোল্‌স্কায়া পশমী কাপড়ের কারখানা-শ্রমিকদের কাছ থেকে ভ্লাদিমির ইলিচ একখানা চিঠি পেলেন।

তিনি চিঠিখানা পড়লেন। অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চম বার্ষিকী আসছিল—সেই উপলক্ষে শ্রমিকেরা ভ্লাদিমির ইলিচকে অভিনন্দন জানাতে চেয়েছিলেন, তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করেছিলেন, আর চিঠির শেষে ছিল: '...আমাদের শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে একটা সামান্য জিনিস পাঠালাম।' জিনিসটা ছিল পোশাক তৈরি করবার পশমী কাপড়।

চিঠির নিচে ছিল সই। দু'-পাঁচ জন নয় — চিঠিতে সই দিয়েছিল চারশ' শ্রমিক।

আর একটা উপহার নিতে হল বলে ভ্লাদিমির ইলিচ বিরক্তি বোধ করলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের পরবটা মাটি করতে চান নি।

ভ্লাদিমির ইলিচ চিঠির উত্তর লিখতে বসলেন। তিনি লিখলেন:

'প্রিয় কমরেডসব,

আপনাদের অভিবাদন এবং উপহারের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। একটা গোপন কথা আপনাদের বলতে চাইছি: আমাকে আর কখনও কোন উপহার পাঠাবেন না। আমার এই গোপন অনুরোধের কথা অনুগ্রহ করে যত বেশি শ্রমিককে সম্ভব জানিয়ে দেবেন।

আন্তরিকতাসহকারে,

ভ. উলিয়ানভ (লেনিন)।'

ক্লিন্‌ৎসি শহরের শ্রমিকেরা লেনিনের চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন।

তবে, উপহারটাকে তিনি অনুমোদন করেন নি, সেটাও তাঁরা বুঝেছিলেন। এই গোপন অনুরোধটাকে নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরা সেটা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং গোটা শহরে আর সমগ্র অঞ্চলে কথাটাকে তাঁরা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

জ. ভস্ক্রেসেনস্কায়া

চোরিফুল

১৩৪ নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্না হাত-ঘড়ি দেখলেন — যে বাক্যটা পড়ছিলেন সেটা শেষ করে তিনি বই বন্ধ করলেন। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন:

'আজকের মতো যথেষ্ট। ক্লান্তি বোধ করছি।'

ভ্লাদিমির ইলিচ বুঝলেন তাঁকে পড়ে শোনাবার জন্যে ডাক্তারেরা যে সময় বেঁধে দিয়েছেন সেটা শেষ হয়ে গেছে। আর্মচেয়ার থেকে উঠে তিনি গেলেন জানালার কাছে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল: নভেম্বর মাসের ঠান্ডা বৃষ্টি। লিন্ডেনগাছের কালো মখমলের মতো ডালগুলোয় বৃষ্টি জলের মুক্তার মতো ফোঁটাগুলো কেঁপে কেঁপে চিকচিক করছিল। উষ্কোখুষ্কো বিরক্ত চড়ুইগুলো ভেজা পথে চলছিল লাফিয়ে লাফিয়ে। হঠাৎ পাখিগুলো ঝাঁক বেঁধে উড়ে গিয়ে পড়ল ফাঁকা পাখির ঘরটায়।

রাস্তায় কিছু কিছু লোক দেখা গেল। দুটি স্ত্রীলোক — তাদের মাথায় ঘোমটার মতো করে বস্তা পরা। তাদের পিছনে দুজন পুরুষ — তাদের মাথায় টুপি, আর পরনে মোটা কাপড়ের জ্যাকেট। এরা এখানে আগে কখনও আসে নি সেটা স্পষ্ট: বড় ফুলের কেয়ারিটার সামনে এসে তারা ভাবতে লাগল কোন দিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকবে।

ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন:

'কারা যেন আমাদের বাড়িতে আসছে।'

নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্না নিচে গেলেন। মারিয়া ইলিনিচ্না তাড়াতাড়ি উঠছিলেন উপরে। তিনি জানালেন:

'ভ্লাদিমির ইলিচের সঙ্গে দেখা করতে গুখোভো থেকে লোক এসেছে।'

নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্না বিব্রত হয়ে তাকালেন — কেননা, ভ্লাদিমির ইলিচের কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করায় ডাক্তারের নিষেধ ছিল।

ওদিকে ভ্লাদিমির ইলিচ ততক্ষণে রেলিংয়ের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন:

'কী ব্যাপার? কারা এলেন?'

তাঁর বোন জানালেন:

'ভালোদিয়া, গুখোভো থেকে এসেছেন শ্রমিক প্রতিনিধিদল। তোমার জন্যে একখানা চিঠি নিয়ে এসেছেন তাঁরা। আমি এখুনই চিঠিখানা নিয়ে আসছি।'

ভ্লাদিমির ইলিচ চটপট কলারের বোতাম আঁটতে আঁটতে বললেন:

'ওঁদের উপরে আসতে বলো।'

১৯২২ সালের শরৎকালে



গর্কি এবং তার কাছাকাছি এলাকায় বিশ্রাম করতে লেনিন পছন্দ করতেন। এমন মনোরম জায়গা সেখানে আছে অনেক।



চিত্তবিনোদনের জন্যে তিনি বেড়াতে ভালবাসতেন



'ছবি যদি তোলা হবেই তাহলে তাতে থাকা চাই সবারই।' ভ্লাদিমির ইলিচ, নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্না, লেনিনের ভাগ্নে ভিক্তর, আর রাষ্ট্রীয় খামারের একজন কর্মীর মেয়ে ভেরা।



লেনিন পশু-পাখি ভালবাসতেন



গর্কিতে লেনিনের কামরা। বিপ্লবের আগে এটা এক ধনী জমিদারের সম্পত্তি ছিল।



মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে তিনি এই ফোনটা ব্যবহার করতেন



লেনিনের ডেস্ক



রাশিয়ায় যেসব মিউজিয়মে সবচেয়ে বেশি
লোক যায় সেগুলির মধ্যে একটা গর্কিতে
এই বাড়িটা



নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্না বলতে আরম্ভ করেছিলেন যে, 'ডাক্তারেরা যে বলেছেন...'

কিন্তু ডাক্তারেরা হয়ত ঠিক বলেন নি? নিরিবিলি আর শান্তি-স্বস্তিই লেনিনের জন্যে সেরা ওষুধ, এমনটা তাঁরা ভাবছেন কেন? এই সাক্ষাৎকারে তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন — খুশি কখনও কারও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে না।

দুই নারী পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্না বললেন:

'তা বেশ, ভালোদিয়া।'

লেনিন এবং গ্লুখোভোর শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় পঁচিশ বছর যাবত যোগাযোগ ছিল। এখন এই প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যাবেন — সেটা তিনি হতে দিতে পারেন না। তাঁরা ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলেন। ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে কয়েক ধাপ নেমে এসেছিলেন। তিনি প্রত্যেকের মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

আগে আগে ছিলেন এক মধ্যবয়সী নারী। একখানা লাল রুমাল দিয়ে বাঁধা তাঁর সাদা চুল। তাঁর বাঁ হাতে একটা ফাইল, তিনি লেনিনের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে নিজের পরিচয় দিলেন:

'আমার নাম পেলাগেয়া খলোদোভা — আমি একজন কাটনি।' এই বলে তিনি সসম্ভ্রমে মাথা নোয়ালেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে আছে,' ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন — তাঁর মুখে স্মিত হাসি।

পিছনে তরুণীটির মুখে লাজুক হাসি। তাঁর চিবুকটা সামনে এগিয়ে ছিল — স্বর্ণাভ ফর্সা বেণি দুটো যেন তাঁকে পিছনে টানছিল। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন:

'আমি ক্লাভ্দিয়া গুসেভা। আমি একজন তাঁতি।'

সুগঠিত শরীরের এক বৃদ্ধ, তাঁর পায়ে ভারী বুট — তিনি গালিচার উপর দিয়ে এলেন একটু সঙ্কুচিতভাবেই। একটু আনাড়ী ধরনের হলেও দেখে বোঝা যায় তিনি কাজের লোক।

'আমি দ্মিত্রি কুজ্নেৎসোভ। কামার।'

উঁচু কলারওয়ালা নীল শার্ট-পরা তরুণটির দিকে তাকালেন ভ্লাদিমির ইলিচ।

তিনি নিজের পরিচয় দিলেন:

'গেরাসিম কজ্লোভ। কাটনি।'

ভ্লাদিমির ইলিচ একে একে সবার সঙ্গে করমর্দন করে তাঁদের বসতে বললেন।

পেলাগেয়া খলোদোভা আসবার পথে একটা বক্তৃতার মতো ভেবে রেখেছিলেন — এখন তিনি সেটা মনে করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার বদলে বললেন নিতান্ত মামুলীভাবে:

'আপনার স্বাস্থ্য কেমন আছে, ভ্লাদিমির ইলিচ? কেমন বোধ করছেন এখন?'

'খাসা — খাসাই!'

লেনিন সত্যি কথাই বলছিলেন। সে মুহূর্তে তাঁর মনেও হয় নি যে, তিনি অসুস্থ। এঁদের কাছে তিনি অনেক কিছু জানতে চান; নিজের অনেক ভাবভাবনা তিনি এঁদের জানাতে চান।

পেলাগেয়া খলোদোভা জানালেন:

'আমরা একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। আমাদের কাপড়ের কারখানার বার হাজার শ্রমিক সবাই

প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে। আপনি কোন কষ্ট করবেন না, আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে হবে — কেননা, আপনাকে আমাদের শ্রমিকদের বড় দরকার।'

'আমি চেষ্টা করব,' বললেন ভ্লাদিমির ইলিচ।

মারিয়া ইলিনিচ্‌না আর নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্‌না দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন — তাঁরা ভ্লাদিমির ইলিচের মুখে সহৃদয় হাসি ফুটতে দেখলেন।

'শ্রমিকদের কাছ থেকে আপনার জন্যে একখানা চিঠি নিয়ে এসেছি,' এই বলে খলোদোভা সেই ফাইলটা দিলেন লেনিনের হাতে।

ভ্লাদিমির ইলিচ ফাইলটা খুললেন। তাতে ছিল বড় একখানা কাগজ। বড় বড় কালো আর লাল অক্ষরে লেখা তাতে।

'...তোমাকে আমাদের দরকার আজ জার্মানিতে বিপ্লবের প্রসারের দিনে। তোমাকে আমাদের দরকার আমাদের শ্রমের জীবনে, আমাদের সুখে-দুঃখে...'

ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন:

'ধন্যবাদ। আমার প্রতি আপনাদের আস্থার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

খলোদোভা বললেন:

'একটা সামান্য উপহার আমরা এনেছি আপনার জন্যে।'

ভ্লাদিমির ইলিচ ভ্রূকুটি করলেন।

'রাগ করবেন না। আমরা এনেছি কয়েকটা চেরিফুলের চারা,' দ্‌মিত্রি কুজ্‌নেৎসোভ বললেন, 'আপনার জানালার নিচে চারাগুলো আমরা পুঁতে দেব। আসছে বসন্তকালে ফুল ফুটবে — দেখে চোখ জুড়োবে। ফুল হবে ধপধপে শাদা — সেটা হবে আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখুন...'

ভ্লাদিমির ইলিচ জানালার কাছে গেলেন। ফুলের কেয়ারির পাশে সারি দিয়ে দাঁড় করানো ছিল আঠারটা চেরিগাছের চারা। শিকড় জড়ানো ছিল চট দিয়ে। এক এক টুকরো লাল কাপড় দিয়ে প্রত্যেকটা বাঁধা ছিল। হাওয়ায় সিরসির করছিল চারাগাছগুলো। দেখে ভ্লাদিমির ইলিচ ভাবছিলেন বসন্তকালে ফুলে ভরে গাছগুলো কী সুন্দর দেখাবে।

কুজ্‌নেৎসোভ লেনিনের মুখের দিকে তাকালেন। হয় আবেগে, কিংবা অসুস্থ বোধ করার দরুন লেনিনের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। কুজ্‌নেৎসোভ তখন ভাবছিলেন: 'আমাদের পরম প্রিয়! আমাদের জন্যে তুমি কত যে কষ্ট ভোগ করেছ জেলে আর নির্বাসনে। বিদেশে কঠিন অবস্থার মধ্যে তুমি কাজ করেছ। বিষাক্ত বুলেট বিঁধে তুমি জখম হয়েছ। অতিরিক্ত খাটুনিতে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ। এ সবই তো আমাদের জন্যে।'

ভ্লাদিমির ইলিচ যেন আপন মনে বললেন:

'ধবধবে শাদা ফুল। ধন্যবাদ! বড় চমৎকার উপহার।'

বৃদ্ধ কামার শ্রমিকটি আবেগভরে এগিয়ে গিয়ে লেনিনকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরলেন।

'ভ্লাদিমির ইলিচ, আমি কামার, শ্রমিক। তোমার সমস্ত পরিকল্পনা আমরা পেটাই করে গড়ে তুলব...'

ভ্লাদিমির ইলিচ কুজ্‌নেৎসোভকে জড়িয়ে ধরলেন। এইভাবে তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, খলোদোভার গাল বেয়ে এসেছিল এক ফোঁটা চোখের জল — সেটাকে তিনি রুমালের খুট দিয়ে মুছে ফেললেন।

প্রতিনিধিদের নিচ তলায় খেতে ডাকলেন মারিয়া ইলিনিচ্‌না। সেখানে বড় কামরাটা অনেক ফুল আর টবে-পোঁতা পামগাছে ভরা।

টেবিলে খাবার সাজানো ছিল, সামোভার ফুটছিল। কিন্তু খাবার ইচ্ছে ছিল না কারও। তাঁদের মন পড়েছিল উপরে লেনিনের কাছে।

মারিয়া ইলিনিচ্‌না বললেন:

'কমরেডসব, আরম্ভ করুন। এই যে, এই বেঙের ছাতাটা খান — ভ্লাদিমির ইলিচ নিজে তুলে এনেছিলেন এই বেঙের ছাতা।'

তাঁর পাশেই টেবিলের উপর এক গাদা খবরের কাগজ ছিল। সবার উপরে একখানা 'প্রাভদা'। বিভিন্ন শিরোনামা দেখা যাচ্ছিল: 'জার্মান বুর্জোয়ারা এগুচ্ছে', 'জার্মানিতে ভুখা', 'বুলগেরিয়ায় শ্বেত সন্ত্রাস', 'পোল্যাণ্ডে শ্রমিক ধর্মঘট'।

মাথা নেড়ে কাগজগুলো দেখিয়ে কুজ্‌নেৎসোভ বললেন:

'দুনিয়ার সর্বত্র বুর্জোয়ারা চূড়ান্ত মাত্রায় হিংস্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভয় নেই! জার্মান শ্রমিকেরা, বুলগেরিয়ার শ্রমিকেরা আর পোল্যাণ্ডের শ্রমিকেরাও ক্ষমতা দখল করবে।'

'লেনিন এ বিষয়ে নিশ্চিত,' বললেন মারিয়া ইলিনিচ্‌না।

পেলাগেয়া খলোদোভা বললেন:

'আপনাদের এখন কাজের সময়, আমরা যাচ্ছি।'

'না, না, এমন বৃষ্টি বাদলের মধ্যে নয়,' মারিয়া ইলিনিচ্‌না আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'এই রাতে আমি আপনাদের বাইরে যেতে দেব না। রাত্রে সবাই থাকুন এখানে। চারাগুলো লাগাতে পারবেন সকালে।'

প্রতিনিধিরা পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করলেন। সবাই এতে খুশি: ভ্লাদিমির ইলিচের কাছ থেকে চলে যাবার ইচ্ছা ছিল না কারও।

মারিয়া ইলিনিচ্‌না জানতে চাইলেন কারখানার শ্রমিকদের বিশেষ কোন কিছুর দরকার আছে কিনা।

তখন গ্লুখোভোর শ্রমিকদের প্রয়োজন ছিল অনেক কিছু। যুদ্ধের পর বিপর্যস্ত অবস্থা ছিল, তার জের তখনও মেটে নি। কিন্তু তার কোন কথাই তাঁরা তুললেন না।

'আমাদের একমাত্র অনুরোধ আর একমাত্র কামনা — লেনিন ভাল হয়ে উঠুন!'

প্রতিনিধিরা সারা রাত জেগেছিলেন। তাঁরা গোল হয়ে বসে ফিসফিস করে কথা বলছিলেন, আর অনুভব করছিলেন বাড়িটার নিস্তব্ধতা।

পরদিন সকালে মারিয়া ইলিনিচ্‌না এলে সবাই জানতে চাইলেন রাতটা লেনিনের কেমন কেটেছে।

মারিয়া ইলিনিচ্‌না বললেন:

'ওঁর বেশ ভাল ঘুম হয়েছে। ঘুম থেকে ওঠার পরে ওঁর মেজাজ বেশ ভাল ছিল। আপনাদের চিঠিখানা উনি পড়লেন আরও একবার। চিঠিখানা তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছে।'

সেদিন ঝলমলিয়ে রোদ উঠেছিল। খানাগুলোয় জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। বরফ পড়েছিল রাত্রে। চেরিগাছের চারাগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ফুল ফুটেছে। গাছের ডালে ডালে চুড়ইগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল — তাদের পায়ের ঘায়ে বরফের কণাগুলো কালো মাটিতে ঝরে পড়ছিল ফুলের পাপড়ির মতো।

*

প্রতি বছর বসন্তকালে যখন মাটির প্রাণ ফিরে আসে, আর প্রথম সূর্যের কিরণে বনে বনে, প্রান্তরে কচি সবুজ পাতা বেরয় গাছে, তখন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন যে বাড়িটায় ছিলেন জীবনের শেষ ক'বছর, সেই বাড়ি ঘিরে সেই চেরিগাছগুলো ফুলে ভরে যায়। লম্বা ঋজু গাছগুলো তখন যেন কিশোর পাইওনিয়রদের মতো ফুটফুটে শাদা জামা গায়ে—তাদের শাখাগুলো যেন গর্কি-লেনিনস্কিয়ে থেকে প্রসারিত হয় পৃথিবীর সর্বত্র।

স. আলেক্সেয়েভ

বুলফিঞ্চ

ভ্লাদিমির ইলিচ যখন গর্কিতে পার্কে বেড়াতেন তখন তিনি প্রায়ই একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতেন — সেখানে একটা বার্চগাছের পাশে একটা লম্বা ফারগাছ, আর বার্চটাকে ঘিরে ছিল ঝোপঝাড়।

ভ্লাদিমির ইলিচ সেখানে দাঁড়িয়ে বুলফিঞ্চ পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতেন। শীতকালে সমস্ত পথ আর গাছ বরফে ঢেকে যায়। সমস্ত পাখি তখন চলে যায় দক্ষিণে। থাকে শুধু বুলফিঞ্চ।

সুন্দর সুন্দর পাখি দেখতে ভ্লাদিমির ইলিচ ভালবাসতেন। একটা পাখির বুকের রঙ গোলাপী, তার পাশে আর একটা। উড়ে এসে সেই ডালে বসল আর একটা। এই পাখির বুক লাল টকটকে। দেখলেই বোঝা যায় এই পাখিটা লড়িয়ে আর খুনসুড়ে। তার মাথায় সমস্ত পালক খাড়া খাড়া। ভ্লাদিমির ইলিচ সেটাকে আলাদা করে দেখছিলেন।

বুলফিঞ্চগুলো তাঁর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তারা জানত তিনি কখনও খালি হাতে আসেন না। তিনি আনতেন কখনও রুটির টুকরো, কখনও শণের বিচি — তাদের প্রিয় খাদ্য।

ভোর হলেই বুলফিঞ্চগুলো উড়ে এসে বার্চ গাছে বসে অপেক্ষা করত লেনিনের জন্যে।

বুলফিঞ্চ সাধারণত অস্থির। কিন্তু এগুলো একই জায়গায় থাকে।

লাল-বুক পাখিটা যখন মাথা ঘুরিয়ে পালক বিন্যস্ত করত সেটা দেখতে লেনিনের ভাল লাগত। পাখিটা তখন যেন বলতে চাইত — দেখো, দেখো, সারা দুনিয়ায় আমিই সবচেয়ে সুন্দর পাখি!

'হ্যাঁ, তা ঠিক বটে,' বলতেন লেনিন।

পাখিটা ডালে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে যেত বার্চ থেকে ফারগাছে, সেখান থেকে ঝোপে। লেনিনের মাথায় পাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে পাখিটা বরফে ডুব মেরে আবার গাছের উঁচু ডালে গিয়ে বসে এক চোখ বাঁকিয়ে যেন বলত: দেখো তো আমি কী বাহাদুর!

একদিন সেই পার্কে বেড়াতে বেড়াতে ভ্লাদিমির ইলিচ লক্ষ্য করলেন সেই ছোট্ট চটপটে পাখিটা নেই। তিনি অন্য দিকে বেড়িয়ে আবার ফিরে এলেন — কিন্তু সেই পাখিটাকে দেখতে পেলেন না।

'পাখিটার হল কী?' তিনি ভাবছিলেন।

ইয়েগোর্কা ইসায়েভ নামে একটি ছেলে পাখিটাকে ধরে বাড়ি নিয়ে খাঁচায় পুরে রেখেছিল। বুলফিঞ্চটার জীবনে আর কোন আনন্দ রইল না।

ইয়েগোর্‌কার সঙ্গে ভ্লাদিমির ইলিচের দেখা হয়ে গেল। ছেলেটি পার্কে এসেছিল আবার তার ফাঁদ পাতার জন্যে।

ইয়েগোর্‌কার গায়ে তার বাবার প্রকাণ্ড ওভারকোট আর পায়ে দাদুর ফেল্ট বুট।

ভ্লাদিমির ইলিচ তার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন:

'নরম লাল-বুকের একটা বুলফিঞ্চ দেখেছ এখানে?'

ইয়েগোর্‌কা প্রায় বলে ফেলেছিল যে, সে দেখেছে। কিন্তু লেনিন যদি জিজ্ঞাসা করেন পাখিটা কোথায়। সে বলল:

'না, দেখি নি তো।'

লেনিন উদ্বিগ্নভাবে বললেন:

'শীতে জমে মরে গেল নাকি!'

ইয়েগোর্‌কা প্রায় বলে ফেলেছিল যে, 'সে তো বেশ গরম বাসায় আছে বাড়িতে,' কিন্তু বলতে গিয়েই থেমে গেল।

সে মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল। লেনিন বিচলিত হয়েছিলেন সেটা সে বুঝতে পারছিল।

'বোধ হয় শীতে জমে মরে গেছে, কিংবা বেড়ালে ধরে নিয়েছে।'

'না, না,' ইয়েগোর্‌কা এবার মাথা নেড়ে বলল, 'বেঁচে আছে। আবার ফিরে আসবে।'

'আসবে?'

'হ্যাঁ, আমি জানি, ঠিক আসবে!'

পরদিন ভ্লাদিমির ইলিচ আবার গেলেন সেই বার্চ গাছটার কাছে। ইয়েগোর্‌কা ঠিকই বলেছিল। লাল-বুক সেই বুলফিঞ্চ পাখিটা বসে ছিল একটা ঝোপে। ইয়েগোর্‌কাও দাঁড়িয়ে ছিল কাছেই।

ভ্লাদিমির ইলিচ একবার পাখিটার দিকে, একবার ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তিনি ইয়েগোর্‌কাকে বললেন:

'হ্যালো!' তারপর পাখিটাকে 'হ্যালো' বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় ছিলে?'

পাখিটা ঠোঁট ফাঁক করে এক চোখ বাঁকাল ইয়েগোর্‌কার দিকে।

ইয়েগোর্‌কা ভয়ে আড়ষ্ট। লেনিন বুঝে ফেললে কি হবে?

কিন্তু বুলফিঞ্চটা জোর গলায় গেয়ে উঠল। সব ঠিকঠাক।

ল. ভরোন্‌কভা

লেনিন শিশুদের বড় ভালবাসতেন

গর্কি'র কাছে ইয়াম গ্রামে এক শিক্ষিকা ছিলেন — আলেক্সান্দ্রা নিকোলায়েভ্‌না কলোসভা। এটা ১৯১৮ সালের কথা: সময়টা ছিল রাশিয়ার পক্ষে বড় খারাপ।

একদিন আলেক্সান্দ্রা নিকোলায়েভনার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্‌না ক্রুপ্‌স্কায়া এবং লেনিনের বোন মারিয়া ইলিনিচ্‌না। মারিয়া ইলিনিচ্‌না বললেন:

'কমরেড কলোসভা, আমাদের রাষ্ট্রীয় খামারের শিশুদের জন্যে একটা নার্সারি ইস্কুল আমরা খুলতে চাই।'

এখানে বলা দরকার যে, তখনকার দিনে 'কমরেড' সম্বোধনটা ছিল খুবই নতুন ধরনের। যাঁকে 'কমরেড' বলে ডাকা হত তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থাই তাতে প্রকাশ করা হত।

'ভ্লাদিমির ইলিচ বলছেন শিশুদের ভাল খাবার দরকার, তাদের দেখতে রোগা, তাদের জীবন যাত্রার অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি সেখানে শিক্ষিকা হতে পারবেন?' বলে চললেন মারিয়া ইলিনিচ্‌না।

'এতে কি নারাজ হতে পারি?' ভাবলেন আলেক্সান্দ্রা নিকোলায়েভনা, 'ভ্লাদিমির ইলিচ ভাবছেন নার্সারি ইস্কুল খুলবার কথা — তাতে কি নারাজ হতে পারি?'

তিনি ওঁদের বললেন:

'হ্যাঁ, আমি রাজি।'

গর্কিতে বড় বাড়িটার পাশে ছিল একটা ছোট বাড়ি। সেবার গরমকালে সেখানে নার্সারি ইস্কুল খোলা হল। তবে, সেখানে যেসব ছেলেমেয়ে ভর্তি হল তাদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছিল খুব বেশি — দু' বছর থেকে চোদ্দ বছর। কাজেই, নার্সারি ইস্কুলটা হয়ে দাঁড়াল একটা শিশুভবন।

শিশুভবন

সেই শিশুভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মারিয়া ইলিনিচ্‌না উপস্থিত ছিলেন। সেটা রীতিমতো একটা পরব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অল্প অল্প করে তাঁরা কিছু সাজসরঞ্জাম জোগাড় করলেন। সব টেবিল তৈরি করলেন তাঁরা নিজেরাই। পায়ার বদলে আড়াআড়ি লাগানো বোর্ডের উপর মামুলী তক্তা লাগানো হল পেরেক ঠুকে — সেই হল টেবিল। খাটও তৈরি করলেন তাঁরা নিজেরা। ভাগ্য ভাল — মেয়েদের পোশাকের জন্যে কিছু সুতী কাপড়, আর ছেলেদের শার্ট-প্যাণ্টের জন্যে কিছু ধূসর রঙের কাপড় জুটে

গেল। বলা বাহুল্য, জামা-পোশাক সব সেলাই হল বাড়িতেই। খুশি হয়ে সবাই সেটা করলেন।

ক্রমে এই শিশুভবনের একটা নিজস্ব জীবনযাত্রাপ্রণালী গড়ে উঠল। একটু বড় ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যেত। সন্ধ্যায় তারা পড়া তৈরি করত। খাতা ছিল খুব কম। একটুকরো ছেঁড়া কাগজও ছিল মহা মূল্যবান সামগ্রী। কালি তো ছিলই না। বাচ্চারা খড়ি দিয়ে স্লেটে লিখত। কী একটা বুনো সবুজ বাদাম থেকে তারা কালি গোছের একটা কিছু তৈরি করেছিল।

লেনিন প্রায়ই এই শিশুভবনে যেতেন।

'সব কেমন চলছে?' বাচ্চাদের পাশে বসে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন। তাদের বাড়িতে লেখা

খাতা তিনি দেখতেন। তিনি সব সময়েই বলতেন, 'পড়ো, পড়ো, আর পড়ো! বিদ্যা না থাকলে মানুষ অন্ধ, অসহায়!'

কাগুজে বেঙ

গরমকালে একটু বড় ছেলেমেয়েরা নিজেরাই গারোদ্কি খেলার সরঞ্জাম তৈরি করে ফেলল। এই খেলার জন্যে তারা একটা কোর্ট তৈরি করল। তারা গারোদ্কি খেলত অবসর সময়ে। লেনিন প্রায়ই ঐ বাড়ির পাশ দিয়ে, দু'ধারে ফারগাছওয়ালা লম্বা রাস্তা ধরে পাখ্রা নদী অবধি বেড়াতে যেতেন। বাচ্চারা খেলা করতে থাকলে তিনি দাঁড়িয়ে দেখতেন। এক এক সময়ে তিনিও খেলতেন ওদের সঙ্গে। খেলা খুব জমে উঠত। এক দল আর এক দলকে হারিয়ে দেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করত।

শিক্ষিকারা বাচ্চাদের খেলনা তৈরি করে দিতেন। আলেক্সান্দ্রা নিকোলায়েভ্নার প্রায় সব সময়ই কাটত বাচ্চাদের সঙ্গে। তিনি ন্যাকড়া দিয়ে তাদের পুতুল আর বল তৈরি করে দিতেন।

লেনিনও মাঝে মাঝে আসতেন। তিনিও অনেক সময়ে খেলনা তৈরি করে দিতেন। তবে, তিনি সব সময়ে তৈরি করতেন কাগজের খেলনা।

একবার তিনি কাগজ দিয়ে তৈরি করেছিলেন একটা বেঙ। কাগুজে বেঙটার মাথা ছিল, আর চারখানা পা ছিল — তার একধারে চাপ দিলে বেঙটা লাফিয়ে উঠত। বাচ্চারা খুব আনন্দ পেত তাতে। কাগুজে বেঙটা যত বার লাফাত তারা খিলখিল করে হাসত। বাচ্চাদের আনন্দ দেখে তাদের শিক্ষিকা হাসতেন, আর সেই হাসিতে যোগ দিতেন লেনিনও।

বরফের বল্

গর্কিতে বাড়িটার চারধারে বন ছিল। সেই বনে ছিল লম্বা লম্বা ফারগাছ, বার্চগাছ আর অ্যাশগাছ, আর নিচে ছিল র‍্যাস্পবেরি ইত্যাদি ঝোপঝাড়। বাচ্চারা গরমকালে বনে গিয়ে বেরি কুড়োত, বেঙের ছাতা তুলত। শীতকালে তারা বনে যেত বেড়াতে।

একটা খুব খুশির দিন আমার বিশেষ করে মনে আছে।

বাচ্চারা বনে বেড়াচ্ছিল। ঠেলাঠেলি, হাসাহাসি করে তারা মজা করছিল। হঠাৎ একটা গাছের আড়াল থেকে কে তাদের উপর ছুড়ল একটা বরফের বল্। বাচ্চারা ঘুরে ফিরে দেখবার চেষ্টা

করল কোথা থেকে কে ছুড়ল বল্। ঠিক তখনই আর একটা বরফের বল্ ছুটে এল। লেনিন। তাঁর গায়ে আটপৌরে ওভারকোট, মাথায় ফারের টুপি — তিনি একটা ফারগাছের আড়াল থেকে বরফের বল্ ছুড়ছিলেন।

বাচ্চারা সবাই খেলায় জুটে গেল। তারা সবাই বরফের বল্ ছুড়তে থাকল লেনিনের দিকে। ওদের শিক্ষিকা উদ্বিগ্ন হলেন।

'থামো বাচ্চারা। তোমরা যে অনেকে!'

কিন্তু সে কথায় কেউ কান দিল না। অসংখ্য বরফের বল্ ছুটতে থাকল দু' দিক থেকে। লেনিন এক একটা বল্ ছুড়েই গাছের আড়ালে লুকিয়ে হাসেন — তখন তাঁর গায়ে কেউ বল্ লাগাতে পারে না।

বেশ কিছুক্ষণ চলল এইভাবে। তাঁর গায়ে বল্ লেগেছিল মাত্র দু'-তিন বার। তার প্রতিবারই তিনি হেসে চেঁচিয়ে বলছিলেন:

'সাবাস! অব্যর্থসন্ধানী গোলন্দাজ হবে তুমি দেশের জন্যে!'

বনে সাক্ষাৎকার

রাষ্ট্রীয় খামারটায় যথেষ্ট পশুখাদ্য ছিল না। শিশুভবনের একটু বড় ছেলেমেয়েরা এ ব্যাপারে সাহায্য করতে চাইল। তারা বনে গিয়ে ছোট ডালপালা ভেঙে বড় বড় গাদা করে রাখল। সময়টা ছিল শরতের শেষের দিকে — ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল।

লেনিন গর্কিতে ফিরছিলেন গাড়ি করে। চাকার চাপে চাপে উঁচু-নিচু, খানাওয়ালা বনের পথে গাড়ি চালাতে ড্রাইভারকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। শেষে লেনিনের গাড়ির একটা চাকা আটকে গেল একটা গর্তের মধ্যে।

লেনিন গাড়ি থেকে নামলেন। বাচ্চাদের গলা শুনতে পেয়ে তিনি সেদিকে গেলেন। লেনিনকে চিনে, গাড়ির অবস্থা দেখে তারা ড্রাইভারকে সাহায্য করতে ছুটে গেল। তারা চাকার নিচে গাছের ডাল ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে দিল — তখন ড্রাইভার গাড়িখানাকে টেনে তুলতে পারল ।

লেনিন দেখলেন বাচ্চারা ভিজেছে, তাদের শীত করছে। তিনি একটু হেসে বললেন:

'গাড়ি চড়তে চায় কে?'

স্বভাবতই, চায় সবাই!

'উঠে পড়ো সবাই!' লেনিন বললেন।

সবাই গাড়িতে উঠে পড়ে দেখল লেনিনের জন্যে আর জায়গা নেই। বাচ্চারা অপ্রতিভ হয়ে নেমে যেতে আরম্ভ করল।

লেনিন বললেন:

'না, যে যেখানে আছ বসে থাকো। তোমাদের অসুখ বাধাতে দেব না। আমি সারা দিন বসে বসে ছিলাম আপিসে — এখন একটু পা ছড়াতে চাই।'

তারপর তিনি ড্রাইভারকে বললেন:

'বাদবাকি বাচ্চাদের জন্যে ফিরে আসা চাই।' এই বলে তিনি বাদবাকি বাচ্চাদের উদ্দেশে হাত নেড়ে নিজে বাড়ি চললেন হেঁটে।

নতুন অতিথি

বছরের পরে বছর কাটল। এক, দুই, তিন বছর। লেনিন প্রায়ই যেতেন সেই শিশুভবনে। তাদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতেন, দাবা খেলতেন। সব খেলায় ইচ্ছা করে তিনি নিজে হারতেন।

বাচ্চাদের গান শুনতে লেনিন ভালবাসতেন। তাঁর একটা প্রিয় গান ছিল 'অন্ধকার কারাকক্ষে প্রাণ গেল'। 'ওলিয়া গেল বনে বেড়াতে' গানটাও তিনি ভালবাসতেন — বিশেষত সেটা যখন গাইত বাচ্চারা। তারা আধো-আধো করে কথা বলত, তাদের গান হত বেসুরো। লেনিন স্মিত-হাসিমুখে বসে বসে এইসব গান শুনতেন।

ছেলেমেয়েদের যাদের শিশুভবনের বয়স ছাড়িয়ে গেল তখন তারা চলে গেল, আরও নতুন অনাথ ছেলেমেয়ে ভরতি হল। নতুন কেউ ভরতি হলে সবাই বলত: 'আমাদের নতুন অতিথি এল।'

গর্কি'র শিশুভবনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। নিরাশ্রয় ছেলেমেয়েরা সেখানে আসত অন্ধকারে আলোর নিশানা পেয়ে।

পাখ্‌রা নদীর পাড়ে একখানা বেঞ্চিতে বসতে লেনিন ভালবাসতেন। বসন্তকালে বেশ উষ্ণ একদিন তিনি সেই বেঞ্চিতে বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছিলেন — এমন সময়ে তাঁর কাছে এল ছেঁড়া জামাকাপড়-পরা একটি ছেলে, তার কাঁধ থেকে ঝুলানো একটা বস্তা।

সে জিজ্ঞাসা করল:

'জানেন, লেনিন কোথায় থাকেন?'

'লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে চাও কেন?'

'আমার দরকার আছে। আমার মা-বাবা নেই। আমার মা মারা গেছেন, বাবা নিহত হয়েছেন। লেনিনকে খুঁজে বের করতে বলল সবাই। তারা বলল, তিনি আমাকে শিশুভবনে ভরতি করে নেবেন।'

লেনিন উঠলেন।

'বেশ, চলো। আমি তোমাকে নিয়ে যাব।'

ছেলেটিকে তিনি সোজা নিয়ে গেলেন রান্নাঘরে।

'এই, আর একটি অতিথি এনেছি!'

রাঁধুনী বললেন:

'আর একটি অতিথি! খাসা।'

'সব কেমন চলছে?' লেনিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'খাবারে কুলোয় তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু জিনিস আনাতে বড় বেগ পেতে হচ্ছে। পুল নেই। ঘোড়ায় টেনে গাড়ি নদী পার করে।'

'রুটি যথেষ্ট?'

'তা, ময়দা আছে যথেষ্ট, কিন্তু সব সময়ে রুটিতে কুলোয় না।'

'রোজ যা দরকার তার চেয়ে একটু বেশি রুটি তৈরি হয় না কেন?'

রাঁধুনী লেনিনের সঙ্গে আরও একটুক্ষণ কথা বললেন। তারপরে তিনি একজন শিক্ষিকাকে ডেকে আনতে গেলেন।

'আলেক্সান্দ্রা নিকোলায়েভ্না, একজন শ্রমিক একটি নতুন ছেলে নিয়ে এসেছে।'

আলেক্সান্দ্রা নিকোলায়েভ্না তার সঙ্গে রান্নাঘরে গিয়ে দেখে বলে উঠল:

'আরে, এ যে ভ্লাদিমির ইলিচ!'

রাঁধুনী গ্রাচোভা ভীষণ অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। সে নতুন কাজে লেগেছিল — আগে সে লেনিনকে দেখে নি।

ছেলেটিকে বসিয়ে খাওয়ানো হল। লেনিন সুপটা চেখে দেখলেন। তিনি বললেন:

'খাওয়া হলে ছেলেটিকে স্নান করিয়ে নতুন জামা-কাপড় দিন। ও এখানে থাকবে।'

নতুন 'অতিথি' থেকে গেল শিশুভবনে।

শেষ দেখা

১৯২৩ সালে লেনিন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শহর থেকে দূরে গর্কির তাজা হাওয়ায় বেশির ভাগ সময় থাকবার জন্যে ডাক্তারেরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন।

লেনিনের অসুস্থতা দিন দিন আরও গুরুতর হয়ে উঠতে থাকল, তাই তিনি শিশুভবনে যেতে পারতেন খুব কম। তাঁর সঙ্গে আলেক্সান্দ্রা নিকোলায়েভ্নার দেখা হয়েছিল আর মাত্র একবার।

একদিন আলেক্সান্দ্রা নিকোলায়েভ্না বাচ্চাদের নিয়ে বনে বেড়াতে যাবার সময়ে হঠাৎ লেনিনকে দেখতে পেলেন। চাকাওয়ালা চেয়ারে বসিয়ে নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্না তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। লেনিন তখন আর হেঁটে-চলে বেড়াতে পারতেন না। বাচ্চারা তাঁকে দেখে বলতে থাকল:

'লেনিন দাদু!'

বাচ্চারা তাঁর দিকে ছুটে যেতে চাইছিল।

কিন্তু, আলেক্সান্দ্রা নিকোলায়েভ্না দেখতে পেলেন যে, নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্না প্রাণপণে হাত নেড়ে ইশারা করে বাচ্চাদের থামাতে বলছেন।

শিক্ষিকা বাচ্চাদের ডেকে অন্য দিকে নিয়ে গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় 'বড় বাড়িতে' আলেক্সান্দ্রা নিকোলায়েভ্নার ডাক পড়ল (লেনিন যে বাড়িটায় থাকতেন সে বাড়িটাকে লোকে বলত 'বড় বাড়ি')।

সেখানে মারিয়া ইলিনিচ্না তাঁকে বললেন:

'কমরেড কলোসভা, বাচ্চাদের বাড়ির অত কাছে বেড়াতে না নিলে ভাল হয়। ভ্লাদিমির ইলিচ বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করতে পারেন না বলে খুব কষ্ট পান। তাঁর মনে কোন উদ্বেগ না আসে সেই ব্যবস্থাই করা দরকার। তিনি বড় অসুস্থ।'

বিদায়

তারপরে বাচ্চারা লেনিনকে দেখেছিল মাত্র একবার। নববর্ষ উপলক্ষে তিনি সবাইকে 'বড় বাড়িতে' ডেকেছিলেন। উপহার নিয়ে হাসিখুশি, আনন্দে উত্তেজিত হয়ে বাচ্চারা ফিরল শিশুভবনে।

কিন্তু তার অল্প পরেই 'বড় বাড়ি' থেকে এল নিদারুণ দুঃসংবাদ:

'লেনিন নেই!'

শিশুভবনে নিস্তব্ধতা। রাত কাটল নৈঃশব্দে। সেখানকার কর্মীরা আর একটু বড় ছেলেমেয়েরা কেউ ঘুমোতে পারল না।

পরদিন সকালে তারা লেনিনের কাছে শেষ বারের মতো শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গেল। ফারগাছের ডাল দিয়ে তারা তৈরি করল একটা প্রকাণ্ড স্তবক।

লেনিন শবাধারে শায়িত। শবাধারের পাশে দাঁড়িয়ে ভরোশিলভ*, কালিনিন**, ক্লারা সেৎকিন***। বাড়িতে ভিড়। সারা রাত ধরে লোক এসেছিল। বাড়িতে লোক ধরে না — কিন্তু নিদারুণ নিস্তব্ধতা, যেন খালি বাড়ি।

সেই সকালে শবাধার নেওয়া হল রেল স্টেশনে। মৌন মিছিল চলল তার পিছনে পিছনে। সবাই কাঁদল নীরবে।

রেল স্টেশনে বিরাট জন সমাবেশ। প্রত্যেকটা গাছে বসে বাচ্চারা দেখছিল সেই মৌন মিছিল। জানুয়ারি মাসের সেই দিনটায় শীত ছিল ভীষণ — তবু মাথায় টুপি ছিল না কারও।

স্টেশনে একখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। শবাধার তোলা হলে ট্রেনখানা ছেড়ে গেল।

সেদিন মনে হয়েছিল শিশুভবনের উপর যেন সূর্য জ্বলল না।

---

* ক্লিমেন্ত ভরোশিলভ (১৮৮১—১৯৬৯)—কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত সরকারের একজন প্রবীণ সদস্য।

** মিখাইল কালিনিন (১৮৭৫—১৯৪৬)—কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত সরকারের বিশিষ্ট নেতা।

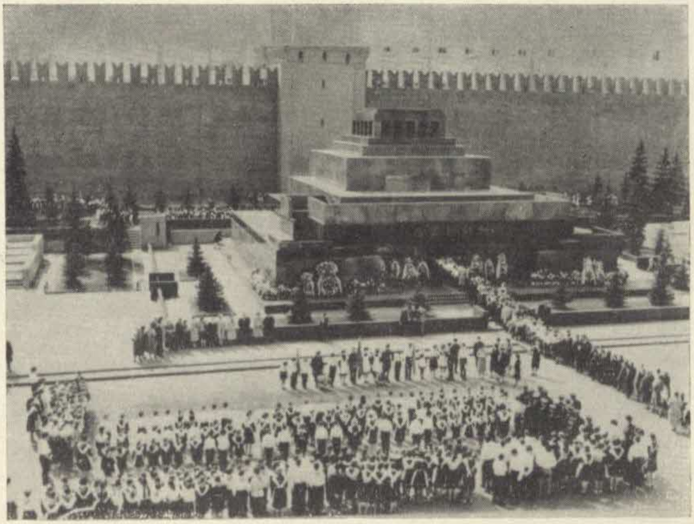
*** ক্লারা সেৎকিন (১৮৫৭—১৯৩৩)—জার্মান এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের বিশিষ্টা নেত্রী।

সমস্ত জাতীয় উৎসবের দিনে সোভিয়েত নর-নারীরা যান রেড স্কোয়ারে, লেনিন মুসলিয়মে



লেনিন ম্যুসলিয়মে কিশোর পাইওনিয়রেরা লেনিনের আদর্শের প্রতি আনুগত্যের পণ করছে

লেনিনগ্রাদে সবার সেরা একটা স্থাপত্যের নিদর্শন দেওয়া হয়েছে কিশোর পাইওনিয়রদের জন্যে

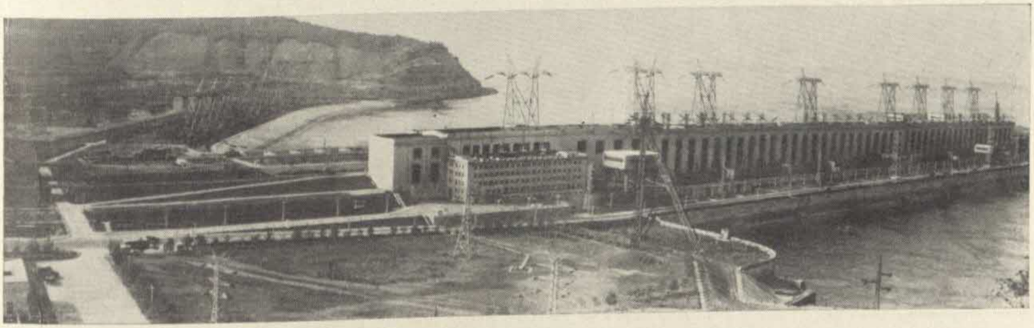




মস্কোয় লেনিন গ্রন্থাগার

ভল্‌গায় এই বিরাট বিদ্যুৎকেন্দ্রটিরও নাম রাখা হয়েছে লেনিনের নামে





মহাকাশযাত্রার আগে ক্রেমলিনে লেনিনের কাজের কামরায় গিয়েছিলেন সোভিয়েত মহাকাশচারিদ্বয় গেওর্গি বেরেগোভয় এবং ভ্লাদিমির শাতালভ

স্‌মল্‌নিতে লেনিনের কামরা: যেমনটি ছিল ঠিক সেইভাবেই বজায় রাখা হয়েছে





স্‌মল্‌নিতে কলম্বিয়ার একটি প্রতিনিধিদল



এই ডেস্কে ফুল থাকে সব সময়ে। সপ্তম শ্রেণীতে পড়বার সময়ে এটা ছিল ভালোদিয়া উলিয়ানভের ডেস্ক



বহু বছর আগে ভালোদিয়া যেখানে পড়তেন সেই ক্লাস-ঘরে পদার্থবিদ্যার একটা পাঠ চলছে

যে বাড়িতে কেটেছিল লেনিনের ছেলেবেলা। বাড়িটা দেখতে গিয়েছিলেন আঙ্গোলা, জাম্বিয়া, কেনিয়া আর গিনীর প্রতিনিধিরা।





লেনিন মুসালিয়মে মালা দিচ্ছেন জওহরলাল নেহরু



লাইপজিগে 'ইস্ক্রা' মিউজিয়মের বাইরে একটা ফলক



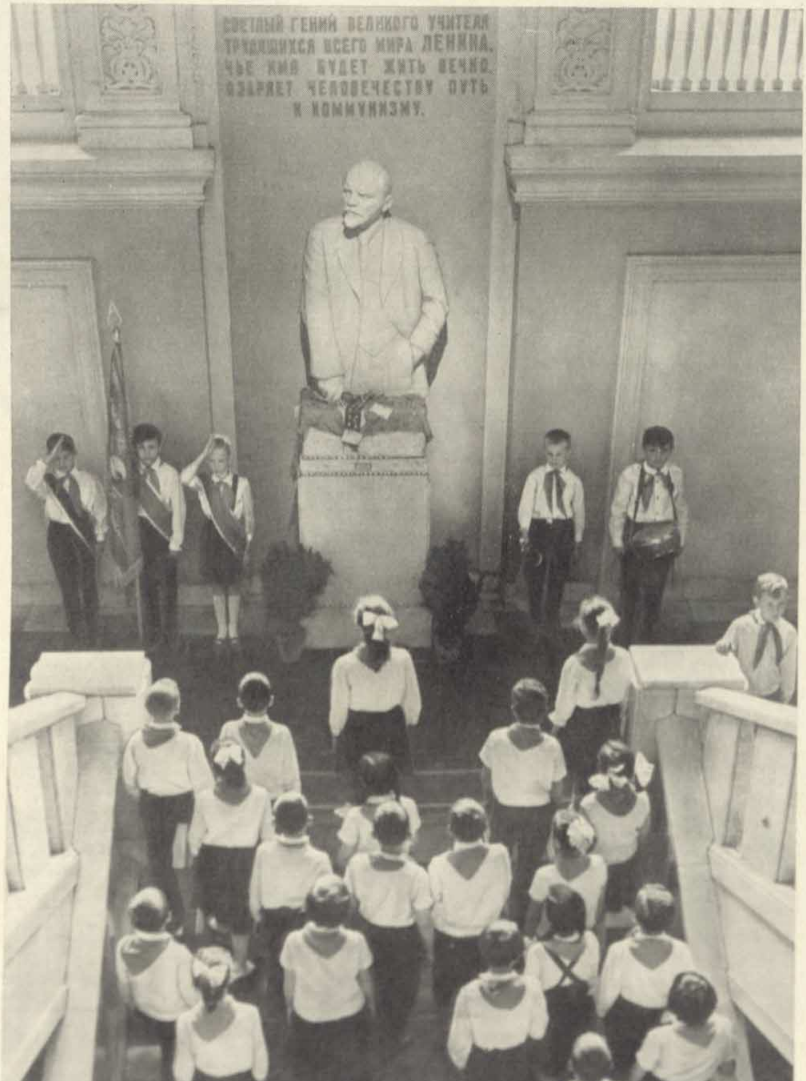
স্মল্নিতে আরব মেয়েদের একটি প্রতিনিধিদল



লেনিন সম্বন্ধে বহু প্রদর্শনীর একটি। এ
প্রদর্শনীটি কিউবার হাভানায়



মস্কোয় লেনিন মিউজিয়মে



সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র ছোট, বড় সমস্ত শহরে লেনিন স্মরণিক আছে।

ককেশাসে একটা দুরারোহ পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা আছে লেনিনের প্রতিকৃতি। পাহাড়টা এত উঁচু যে, দেখলে মনে হয় সেখানে পৌঁছবার জন্যে ভাস্করকে ডানা মেলে আকাশে উঠতে হয়েছিল।

শুশেন্‌স্কোয়ে গ্রামে পাইনগাছগুলোর তলায় লেনিন বিশ্রাম করতে পছন্দ করতেন — সেই গ্রামে যারা যায় তারা অভিজ্ঞান হিসেবে ঐসব পাইনগাছের মোচা নিয়ে আসে। তারা নিজ নিজ বাড়ির কাছে সেই বীজ পুঁতে দেয়। তার থেকে বেড়ে ওঠে পাইনগাছ। এইসব পাইনগাছ সাইবেরিয়ার সেই পাইনগাছগুলির সহোদর। এটাও পরম প্রিয় মানুষটির জীবন্ত স্মৃতি।

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে এইস্‌লেবেন শহরে লেনিন স্মরণিক সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত কাহিনী আছে। সোভিয়েত ফৌজ ঐ শহরে ঢুকবার সময়ে যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছিল। নাৎসীরা তখন সবেমাত্র ঐ শহর ছেড়ে গিয়েছিল — সেই শহরের স্কোয়ারে ব্রোঞ্জে তৈরি লেনিনের মূর্তি দেখে সোভিয়েত ফৌজের সৈনিকেরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। নাৎসী মৃত্যু-শিবিরগুলো থেকে মুক্তি পাবার পরে পোল্যান্ড আর বেলজিয়মের মানুষ, ফরাসী আর চেকরা ঐ শহরের ভিতর দিয়ে গিয়েছিল পুব দিকে। তারাও দেখেছিল লেনিনকে। বোধহয় ঐ মূর্তি দেখেই তারা স্পষ্ট বুঝেছিল যে, ফ্যাশিবাদের নিদারুণ রাত্রি-শেষে আবার প্রাণ ফিরে এসেছে পৃথিবীতে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে দখল-করা এলাকা থেকে নাৎসীরা ঐ মূর্তি এইস্‌লেবেনে নিয়ে গিয়েছিল। তারা মূর্তিটিকে গলিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু ফ্যাশিস্ট-বিরোধী জার্মান শ্রমিকেরা মূর্তিটিকে লুকিয়ে ফেলেছিল। জীবন বিপন্ন করেও তারা এ কাজ করেছিল। সোভিয়েত ফৌজ আসা অবধি তারা মূর্তি রক্ষা করতে চেয়েছিল। নাৎসীরা ঐ শহর ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকেরা শহরের স্কোয়ারে মূর্তিটিকে স্থাপন করেছিলেন। সে মূর্তি আজও রয়েছে সেখানে।

তবে, লেনিন যার স্বপ্ন দেখে গেছেন, সারা জীবন ধরে তিনি যে জন্যে লড়াই চালিয়ে গেছেন, শ্রমজীবী জনগণের প্রতি তিনি যে অনুজ্ঞা দিয়ে গেছেন, সেটাকে প্রতিষ্ঠা করাই সর্বশ্রেষ্ঠ লেনিন স্মরণিক। এমন লেনিন স্মরণিকও স্থাপিত হয়েছে।

সমৃদ্ধিশালী পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলোতে যা করতে লেগেছে এক-শ' বছর, দু'-শ' বছর, সেটা সোভিয়েত দেশে করা হয়েছে পঞ্চাশ বছরে। জমিতে চাষবাস চলছে ট্র্যাক্টর আর কম্বাইন-হারভেস্টার দিয়ে। শক্তিশালী নদীগুলিতে তৈরি হয়েছে বিরাট বিরাট জলবিদ্যুৎকেন্দ্র। দেশে বিজলী আলোর বান ডেকে গেছে। সাইবেরিয়ায় তৈরি হয়েছে কত আধুনিক নগরী — সেগুলিতে আছে নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয় আর থিয়েটার। সোভিয়েত মহাকাশযান নেমেছে চাঁদে, শুক্রগ্রহে। মানুষ সওয়ারী নিয়ে প্রথম যে মহাকাশযান উড়েছে মহাকাশে, তাতে ছিলেন সোভিয়েত নাগরিক। সমগ্র দেশ সুশিক্ষিত না হলে এতসব বিপুল সাফল্য অর্জন করা যায় না। লিখতে-পড়তে জানে না, এমন লোক সোভিয়েত ইউনিয়নে খুঁজে পাওয়া যায় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে শিক্ষা পায়। ইস্কুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন পড়াশুনায় কোন খরচ লাগে না। এইসবেরই স্বপ্ন দেখে গেছেন লেনিন। এই সবই লেনিন স্মরণিক।

সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতি-জাতিসত্তা আছে এক-শ'টার বেশি। তাদের প্রথা-রীতি আলাদা, ভাষা আলাদা, কিন্তু তারা সবাই রয়েছে একই পরিবারের মতো। একই অভিন্ন লক্ষ্য সাধনের জন্যে তারা কাজ করে চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে বহু জাতির এই ভ্রাতৃত্বের মৈত্রীও একটা লেনিন স্মরণিক।

লেনিনের অনুজ্ঞা অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যান্য দেশের মানুষের মুক্তি আর উন্নততর জীবনের জন্যে সংগ্রামে আনুকূল্য করে। আফ্রিকার গ্রামে গ্রামে রোগীর পরিচর্যা করছেন সোভিয়েত ডাক্তারেরা। মিসরের মানুষের জন্যে সোভিয়েত টারবাইন দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে।

সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ভিয়েৎনামের মানুষ আক্রমণকারীদের বিমান ঘায়েল করছে। এ সবের জন্যে সোভিয়েত দেশের মানুষ গর্ব বোধ করে। দেশে দেশে জনগণের মুক্তি সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তাও লেনিন স্মরণিক।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union